আমাদের আলোচনা সমিতি সম্বন্ধেও অনেক কাজের ভার শৈলেশের উপর থাকিত, একবার (২১শে বৈশাখ ১৩১১) রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন, "শৈলেশ Renal colic লইয়া ভুগিতেছে বোধহয় সেইজন্য সমিতির কার্য্য বিবরণ পাঠাইতে পারে নাই, যদিও আমার বিশ্বাস এই colic ধরিবার পূর্ব্বেই সে পাঠাইতে পারিত। কিন্তু শৈলেশকে ত চেনেন। সে পিতৃদত্ত নাম স্বার্থক করিয়াছে। শৈলেশের মতই সে অচল।"

প্রদীপে কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি বঙ্গদর্শনের সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শন, পরিচালনার গুরুতর ভার আমার উপর ছিল—অনেক পত্রে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিলাতী ও দেশীয় অনেক কাগজ হইতে সন্দর্ভ সঙ্কলন করিবার জন্য সেগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার পত্রগুলির পাতা উল্টাইয়া সেই প্রীতি-সম্বন্ধের পূর্ব্ব স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে—সেই সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল,—দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার ও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল ;কিন্তু কখনই আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই—তাঁহার কৃত রাশি রাশি উপকারের কথা বিস্মৃত হই নাই, তাঁর অপূর্ব্ব সঙ্গ-সুখের লোভ মন হইতে দূর করিয়া ফেলিতে পারি নাই। কোটি কোটি লোকের মধ্য হইতে যাঁহাকে বাছিয়া লওয়া যায়, —যিনি সমগ্র জাতির নিকট ভগবানের এক মহোপহার—তাঁহাকে লইয়া বন্ধুবর্গের শ্লাঘা হইবে—ইহার সহজেই অনুমান করা যায়। কেন যে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল—এ ক্ষতি তাঁহার নহে, সম্পূর্ণ আমার, তথাপি কি কারণে এই ক্ষতি সহ্য করিয়াছিলাম—তাহা পরস্পরের কতকগুলি ভুল ভ্রান্তির ইতিহাস, তাহা না বলাই ভাল। দুই বৎসর হইল, আমি তাঁহাকে মনের আবেগে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম—কথাগুলি

হৃদয় ছুঁইলে, কবির হৃদয়ে সাড়া পড়িবেই পড়িবে। আমি তাঁহার নিকট হইতে যে উত্তর খানি পাইয়াছিলাম, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ওঁ শান্তি নিকেতন

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

আজ আপনার পত্রখানি পাইয়া আমার মনের একটি ভার নামিয়া গেল। আমার প্রতি আপনার চিত্ত প্রতিকূল, এতদিন এই কথাই মনে জানিতাম। এরূপ বিশ্বাস যে কেবল পীড়াজনক তাহা নহে, ইহা অনিষ্ট-জনক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ বিকার হইতে আপনি মুক্তিলাভের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমাকেও মুক্তি দিয়াছেন, সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার সহিত পরিচয়ের আরম্ভ হইতেই আমি সর্ব্ব প্রযত্নে আপনার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কেমন করিয়া যে বিপরীত ফল ঘটিয়াছিল, তাহা আমার ছুগ্রহই জানে। আমি এই জানি আমি কখনই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার ক্ষতি বা বিরুদ্ধতা করি নাই। কিন্তু এ সকল কথা বিচার করিবার আর প্রয়োজন নাই, জীবনের অনেক গ্লানি একে একে মুছিবার আছে, অথচ সময় আছে অল্প—এই যে একটা দাগ মন হইতে মিটিল, সে বড় কম কথা নহে। * * * * * এবার কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম,এ পরীক্ষায় বাংলাভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আপনি শরীরে মনে স্বাস্থ্য শান্তিলাভ করুন, অন্তরের সহিত এই কামনা করি। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতা।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত উন্নতি হইয়াছিল। পুস্তক ও অনেক লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের দ্বারা আর্থিক অনেক সুবিধা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তার পর 'রামায়ণী কথা, সতী, বেহুলা, ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ, জড়ভরত, ফুল্লরা, স্বকথা, প্রভৃতি অনেক পুস্তকই লিখিয়াছিলাম। ইহার প্রত্যেক খানি পুস্তক পাঠ্য হইয়াছিল। অপরাপর পুস্তকেরও বেশ বিক্রয় হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রিডার নিযুক্ত হইয়া এবং বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় সঙ্কলন করিয়া আমি কয়েক হাজার টাকা পাইয়াছিলাম। পরে সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রামতনু লাহিড়ী রিছার্চ্চফেলো নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তখন ঐ পদের বেতন ছিল মাসিক ২৫০শত টাকা, এখন ৩৫০টাকা হইয়াছে। আমার হাতে যা টাকা জমিয়াছিল, তদ্বারা কলিকাতার বাড়ী ত্রিতল করিয়াছিলাম, এবং বেহালায় জমি কিনিয়া ত্রিতল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া পুত্রদিগের শিক্ষা ও আর দুটি মেয়ের বিবাহে সেই সঞ্চিত অর্থের প্রায় সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। প্রথম বৎসর (১৯০৭ সনে) রিডার হইয়া আমি ইংরেজীতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত হই। এই পুস্তকখানি সমাধা করিয়া আমি দুইজনকে দেখাইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসুর নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মিস্ মারগ্রেট নোবেলের নাম —ইনি "নিবেদিতা" নামেই বঙ্গ-সমাজে পরিচিত। আমাদের কলিকাতার বাড়ীর পার্শ্বেই বোসপাড়া লেনে (এখন 'নিবেদিতা লেন') ইনি একটি

ছোট খাটো দ্বিতল বাড়ীভাড়া করিয়া মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। একদিন সকালবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া পুস্তকখানি তাঁকে দেখাইবার প্রস্তাব করি, তিনি তখনই স্বীকার করিলেন, "আমি বলিলাম পুস্তকখানি খুব বড়।" "তা হোকনা, আমি যখন বলেছি, তখন দেখে দেব।" এই বলিয়া তিনি হাসিমুখে আমাকে বিদায় করিলেন।

নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন, আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার সঙ্গে একবারেই করিতে চাহিতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতেন,—রাজনৈতিক কোন কথা বলিলে ক্রোধের সহিত বলিতেন—"দীনেশবাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে,—আমি আপনার সঙ্গে ওসম্বন্ধে কথা বলিব না।"

কিন্তু তা সত্বেও তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পুস্তকখানি পড়িতে লাগিলেন। ইংরেজী "ইডিয়ম" সংক্রান্তে ভুল মাঝে মাঝে না পাইতেন, এমন নহে, কিন্তু তিনি মোটের উপর বলিতেন, "আপনার ইংরেজী ভাল"—ভাবের দিক্ দিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার সর্ব্বদা তর্কবিতর্ক ও বিরোধ চলিত;—সে সম্বন্ধে তাঁর মতগুলি এত দৃঢ় ছিল—যে তিনি কোন মতেই প্রতিকূল হইলে আমার মত মানিয়া লইতেন না, হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কথা, অথচ তাঁহারই কথা আমাকে মানিয়া লইতে হইবে, এই দায়ে পড়িলাম। ধনপতি সদাগরের স্ত্রী খুল্লনা ছাগল রাখিতে বনে প্রেরিত হইয়াছিল—এই অপরাধে জ্ঞাতিগণ তাঁহার হাতে খাইবেন না বলিয়া ঘোঁট করিয়া বসিলেন—এক হয় অগ্নি কিংবা বিষ-পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া চরিত্রের শুদ্ধতা সর্ব্ব সমক্ষে প্রমাণ কর—নতুবা এক লক্ষ টাকা খেসারৎ দিয়া তাহাকে ঘরে রাখ—অন্যথা আমরা তোমাকে সমাজ-

চ্যুত করিব।” আমি ধনপতির গল্প লিখিতেছিলাম, সুতরাং এ সকল কথা বাদ দেই কি করিয়া? কিন্তু নিবেদিতা জেদ করিয়া বসিলেন, “বাদ দিতেই হবে।” স্ত্রীলোকের জেদ—সে যে ভীষণ তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? তাঁহার যুক্তি এই—“জোর ক’রে তার সতিনী তাকে ছাগল রাখিতে বনে পাঠিয়া দিয়ে তার উপর জুলুম করলে, তাকে ঢেকি-শালে শুইতে দিলে, আধপেটা খাইয়ে চূড়ান্ত কষ্ট দিলে। সামাজিক বিচারপতিগণ এজন্য লাহনার কোন শাস্তি না করে, নিপীড়িত নিরপরাধ খুল্লনার উপর উল্টো শাস্তির ব্যবস্থা করলেন, এ কেমন সমাজ? আপনার গল্পে যদি একথা থাকে—তবে পৃথিবীর লোক এ টাকে “কাজির বিচার” ব’লে আপনাদিগকে ঠাট্টা করিবে—‘নো’ ‘নো’ ‘নো’ একথা আপনি রাখতে পারেন না, গল্প হ’তে এটি ছেটে ফেলুন।” আমি বলিলাম—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের চরিত্র-মর্য্যাদার আদর্শ অন্যরূপ—সে মাপ-কাটি বাতাসে নড়ে, তা আপনাদের common sense (সহজ বুদ্ধি) দিয়া বুঝ্‌তে পারবেন না, ধরুন যদি বীণাটির তারে সুর দিয়া বাদক রাখিয়া দেন, আর যদি একটা হাওয়া নড়িয়া গিয়া কোন তারটা একটু শিথিল হয়,—তাহাও সেই বাদক সহ্য করিতে পারেন না—যাবৎ তার কাণে একটুকুও বাধ্‌বে—সে পর্য্যন্ত তিনি রাগ-রাগিনী বাজাবেন না। আমাদের সামাজিক বিধানে স্ত্রীলোক দেবীর ন্যায় পূজা পাইয়া থাকেন—সেই দেবতা সর্ব্বপ্রকার কলঙ্কও গ্লানির উপরে থাকিবেন—কোন প্রতিকূল মন্তব্যের লেশমাত্র হইলে তাঁহার স্বামী, পুত্র ও আত্মীয়গণ লজ্জায় মরিয়া যাইতেন, এইজন্য রাম সীতাকে নিরাপরাধ জানিয়াও বনবাস দিয়াছিলেন। এখানে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠেনা,—কৌস্তভমণিতে যদি একটা সুতার তুল্য দাগ লাগে তবে মণিরাজের মূল্য কমিয়া যায়। স্ত্রীলোককে এতটা সখের পোষাকী জিনিষের মত করিয়া রাখা ব্যবহারিক

জীবনের পক্ষে সুবিধাজনক এমন কি ন্যায়-সঙ্গত কি না—তাহা আমি জানি না, স্ত্রীলোক যে জহর-ব্রত করিয়া—সতী সাজিয়া—আগুনে পুড়িয়া মরিত, তা ও এই আদর্শ পবিত্রতা রক্ষার জন্য—সিজারের স্ত্রীর সম্বন্ধে কথাটি হইতে পারিবে না,—এই প্রবাদের অনুকূলে আমাদের সামাজিক আদর্শের সৃষ্টি! ন্যায়-অন্যায়ের সীমা অনেকটা নীচেকার কথা। এক জাতি যদি কোন একটা জিনিষকে খুব বড় করিয়া দেখে,—এত বড় করিয়া দেখে যে পার্থিব ব্যবহারিক নীতি ততদূর পৌঁছায় না, ঐন্দ্রজালিক রূপ দিয়া দেখে, যাহা ফুঁএর ভর সহ্য করে না,—ভাবের রাজ্যে সে একটা মস্তবড় বাহাদুরী—আপনাদের সমাজে কাটখোট্টা, জীবনযাত্রা চালাইবার পক্ষে সুবিধাজনক ও মোটামুটি ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু এদেশের কাব্য, জীবন ও সমাজ সমস্তই একটা বিশেষ ভাবমূলক, সেই ভাবের যাদুকাটি হাতে না থাকিলে এই সমাজের মন্দিরে আরতি দেখিবার প্রবেশাধিকার হইবে না।"

এই ভাবে কোন একটা কথা লইয়া তর্ক বাধিত, হয়ত পুস্তকের এক লাইনও পড়া হইল না, দুইদিন তর্ক-যুদ্ধে কাটিয়া যাইত। নিবেদিতা নিজের জেদ বজায় রাখিতে সময়ে সময়ে এতটা বদ্ধপরিকর হইতেন, যে বলিয়া বসিতেন—"দীনেশবাবু ঠিক বল্‌ছি, যদি এই অংশটা পরিবর্তন না করেন, তবে আমি এ পুস্তক আর পড়্‌ব না।" আমি প্রমাদ গণিতাম ও তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য খানিকটা পরিবর্তন করিতাম, নিজের ভাবের সঙ্গে না মিলিলে তিনি থামিয়া যাইতেন, কিছুতেই এগুতে চাহিতেন না, ঠিক হাতীটা পাঁকে পড়িলে যেরূপ হয়,—সেইরূপ কোন একটা অংশে আসিয়া থামিয়া পড়িতেন। এটা ভুলিয়া যাইতেন যে পুস্তকের মতামতের দায়িত্ব আমার—ইংরেজী সংশোধনের ভার তাঁকে দিয়াছি—এইখানে তাঁর স্ত্রীলোক জনোচিত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি।

কোন একটা বিষয়ের ভার লইলে তিনি এটা মনে করিতে পারিতেন না, যে উহা পরের। সেটি সম্পূর্ণ আপনার ভাবিয়া খাটিতেন,—এই ভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না; কোন দিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তিনি খাটিয়াছেন, ইহার মধ্যে তিনিও আমি ২।৫ মিনিটের জন্য খাইয়া লইয়াছি মাত্র,—এরূপ নিস্বার্থ, আত্মপর ভাব-বিরহিত,প্রতিদান সম্পর্কে, শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী কার্য্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানিনা। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্ম্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম, আর একজনের মধ্যে পাইয়াছিলাম, তিনিও পাশ্চাত্য জগতের লোক, তাঁহার কথা পরে লিখিব।

ইংরেজীর সংশোধন পুস্তকে অল্পই হইয়াছে—বেশীর ভাগ ভাব-সংশোধন। কবিতা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসামান্য ছিল। শূন্য-পুরাণের শিবসম্বন্ধে একটা ছড়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত আছে—"শিব, তুমি কেন ভিক্ষা করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীন-বৃত্তি,কোন দিন কিছু জোটে, আর কোন দিন রিক্ত ভাণ্ডে ফিরিয়া আস, তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, তা'হলেই তোমার এ কষ্ট দূর হইবে। হে প্রভু, তুমি কতদিন উলঙ্গ হইয়া অথবা 'কেঁওদা' বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে? যদি কাপাস বুনিয়া তুলো তৈরী কর—তবে কাপড় পরিতে পাইয়া কত সুখী হইবে।" এই ভাব-সম্বলিত পয়ারের মধ্যে যে ভারতীয় কোন অপূর্ব্ব প্রেরণা থাকিতে পারে তাহা তো আমার মনেই হয় নাই, কিন্তু তিনি ঐ স্থানটি পড়িয়া একবারে লাফাইয়া উঠিলেন, কেবল "আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য" এই কথাটি বারংবার বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "ভগিনী, এটাতে এমন কি জিনিষ পেয়েছেন, যে দীন দরিদ্র

হঠাৎ রাজ্য পেলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আপনি সেইরূপ হয়ে পড়েছেন !" নিবেদিতা সেই কবিতাটি হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া, এক হাত দিয়া অপর হাত চাপিয়া ধরিয়া আনন্দগর্ব্বফুল্ল চোখে কেবলই বলিতে লাগিলেন "ও দীনেশ বাবু, এটা একটা আশ্চর্য্য জিনিষ।" আমি ভাবিলাম, ক্ষেপা মেয়ের মাথায় যেন কি হয়েছে। সেই সময় সেখানে আর একজন মেম-সাহেব ছিলেন, আমি তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। পরদিন তাঁহাকে নিরালা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "নিবেদিতা এই শিবের কবিতায় এমন আশ্চর্য্য কি পাইয়াছেন, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি শুনিয়াছেন ?" তিনি বলিলেন "শুনেছি. সাধারণ ভক্ত ও উপাসক তাঁহাদের দেবতার নিকট সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা করেন "ঠাকুর আমায় ধন দিন্, যশ, দিন্, মান দিন্, স্বাস্থ্য দিন্"—তাঁহারা কতকি বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঐ কবিতায় ভক্ত তাঁর উপাস্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের দুঃখের কথা তাঁর মনে নাই ; ঠাকুরের দুঃখে তাঁর প্রাণ গলিয়া গিয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট যাতে নিবারণ হয়, তাই তাঁর ভাবনার লক্ষ্য হইয়াছে।"

আমি তখন নিবেদিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। গ্রাম্য ছড়া-গুলি সম্বন্ধে যদি আমি হেলায় অশ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি, তবে নিবেদিতার নিকট গালমন্দ খাইয়াছি। তিনি বলিতেন "বড়বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জ্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে। আপনি কৃষকগণের গান অবজ্ঞা করিবেন না, তাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও কান্না আছে,—তাঁদের সরল কথায় আভিধানিক জ্ঞান না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাঁদের কুঁড়ে ঘরে সোনা-রূপার থাম না থাকিলেও আঙ্গিনায় সিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।"

বই পড়িবার সময় তিনি আমার প্রতি যে কত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যাইতেন তাহার অনেকগুলিতে আমি বিরক্ত হইতে পারিতাম কিন্তু বিরক্ত হই নাই; কেননা আমি তাঁহার রুষ্ট কথার মধ্য দিয়া তাঁহার অতি কোমল পুষ্প কোরকের মত সহৃদয়তায় ভরপুর প্রাণটি দেখিতাম। কখন ও বলিতেন, "দীনেশ বাবু, আপনার মত বোকা আমি জগতে আর একটি দেখিনাই; আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা আমি স্ত্রীলোক হলেও আমাকে অবাক্ করে ফেলেছে।" আবার হয়ত পড়িতে পড়িতে আর এক জায়গায় পৌঁছিয়া বলিতেন "দীনেশ বাবু, আপনি সত্যই একজন প্রধান কবি, আপনার লেখা গদ্য হইলে কি হইবে, আপনার ভাষা প্রকৃত কবির। আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব্ব।" কখন ও অতিরিক্ত গালাগালি কখন ও অতিরঞ্জিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হইয়া আমি উভয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতাম। কিন্তু বাহিরের কোন লোক আসিলে দুচারটি কথায় আমার যে পরিচয় দিতেন তাহাতে অবশ্য আমি শ্লাঘা বোধ করিতাম। একবার তাঁহার কোন এক ইংরেজ বন্ধু দেখা করিতে আসিলে তিনি আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন— "বঙ্গদেশের সামাজিক তত্ত্ব ইনি যেরূপ জানেন, এই দেশের কুঁড়ে ঘর হইতে রাজ-প্রাসাদ পর্য্যন্ত সকল জায়গার ইতিহাস যাহা উনি ছেঁড়া পুথি-পত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছেন—সে বিষয়ে ইহার সমকক্ষ কেউ নাই" ইত্যাদি।; আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন গণেন ব্রহ্মচারী, ইহঁার ভাঙ্গা ইংরেজী লইয়া আমি প্রায়ই ঠাট্টা করিতাম। নিবেদিতা বলিতেন "গণেন ইংরেজীতে ওর মনের ভাব বুঝাইতে পারে, এটুকু আমার স্বীকার করিতেই হইবে, যেটুকু না পারে, হাত মুখের ভঙ্গীতে সেটুকু আর বুঝিতে বাকি থাকে না।" কিন্তু নিবেদিতা বাঙ্গালা বেশ ভাল বুঝিতেন, গণেন তাঁহার ভাষা-জ্ঞানের গভীরতা প্রতিপন্ন করার মানসেই মাঝে মাঝে

ইংরেজী বলিতেন। নিবেদিতা আমার পুস্তকে বৈষ্ণব কবিতা ও আগমনী গানের প্রশংসা পড়িয়া প্রায়ই আমাকে তাগাদা করিতেন, একজন বৈষ্ণব কীর্ত্তনিয়া আনিয়া তাঁহাকে গান শুনাইতেন। আমি আগমনী-গায়ক একজন বৈষ্ণব ভিখারীকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে গান শুনাইয়াছিলাম। "গিরি, গৌরী আমার এসেছিল" গান শুনিয়া তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গায়ককে একটি টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। কতকদিন তাহার বাড়ীতে অতিথি হইয়া ছিলেন—এলেক্‌জেণ্ডার নামক এমেরিকা-বাসী বিংশ বর্ষ বয়স্ক এক বালক। ইঁহার অতি অসামান্য প্রতিভা ছিল, এই অল্পবয়সে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ করিবার তাঁহার যে শক্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা বিদেশীয়ের পক্ষে বিস্ময়কর। নিবেদিতা বলিতেন, এই বালকের লিখিবার ক্ষিপ্রকারিতা লক্ষ্য করা চক্ষুর অপর্য্যাপ্ত আনন্দ। টাইপরাইটার যন্ত্রটা যেন ইহার দ্রুত রচনার তাল সামলাইতে পারেনা।" এলেকজেণ্ডার বিবেকানন্দের জীবন চরিত লিখিয়া ভাবী কর্ম্মঠ ও প্রতিভাশালী জীবনের বহু আশা দিয়া সংসার হইতে সহসা সেই তরুণ বয়সে বিদায় লইয়া গিয়াছেন। নিবেদিতার এক সঙ্গিনী ছিলেন ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা, স্বভাবটি মিশ্রীর মত মিষ্ট,—তাঁহার বাড়ী এমেরিকায়। নিবেদিতা আমার পাণ্ডুলিপি পড়িতে পড়িতে যখন খুসি হইতেন, তখন মাঝে মাঝে বলিতেন", দীনেশ বাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সে দিক দিয়া আপনার কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নহে, মর্ম্মপীড়া দান করে, কিন্তু তবুও আমার আপনাকে ভাল লাগে, কেন শুনবেন? আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খেটেছেন ও দেশের উপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন, যে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশভক্তের স্থানের দাবী করিবার যোগ্যতা রাখেন—এজন্য আপনাকে

আমার ভাল লাগে।" তিনি আমাকে কাপুরুষ বলিয়া প্রায়ই ঠাট্টা করিতেন। একদিন আমি সত্যই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া লজ্জিত হইয়াছিলাম। সেদিন সন্ধ্যাকাল, গণেন, আমি ও নিবেদিতা বাগ-বাজারের রাস্তা দিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমি ছিলাম আগে, তারপর নিবেদিতা এবং সর্ব্বশেষে গণেন। এমন সময় একটা ষাঁড় ক্ষেপিয়া সিং নাড়িতে নাড়িতে আমার সাম্‌নে ছুটিয়া আসিল। আমি প্রাণভয়ে পাশ কাটিয়া পালাইয়া আত্ম-রক্ষা করিলাম, কিন্তু আমি সরিয়া পড়াতে যে নিবেদিতাকে ষাঁড়ের সিংএর সম্মুখীন করিয়া গেলাম, তা ভাবিয়া দেখিবার আমার অবকাশ হয় নাই। গণেশ তাড়াতাড়ি এগিয়া এসে ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে দিলেন; তারপর তিনজনে আবার একত্র হইলাম। তখন নিবেদিতা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনি পুরুষ জাতির আজ মুখ উজ্জ্বল করেছেন। একটি নিঃসহয়া রমনীকে ষাঁড়ের সামনে ফেলে দিয়া নিজের জীবন রক্ষা করেছেন, অদ্যকার এই কাজটি আপনার একটা কীর্ত্তি-স্তম্ভের মত হইয়া রহিল।" তারপর হাসির ছটা মুখ হইতে চলিয়া গেল, এবং একটু ঝাঁজালো সুরে বলিলেন "দীনেশবাবু আপনার একটা লজ্জা হ'ল না?" আমি কাজটা ভাল করি নাই, সেইজন্য অন্য সময় যেরূপ কথা কাটাকাটি করি, তা না করিয়া চুপ হইয়া রহিলাম। তিনি রাস্তায় যাইতে সাহেবদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না, কিন্তু বাঙ্গালীদিগকে খুব সম্মান দেখাইতেন। একদিন তিনি আর আমি ট্রামে যাইতেছিলাম, এমন সময় একজন ইংরেজ আসিয়া তাঁহার গা ঘেষিয়া বসিলেন, তিনি এমন তীব্রভাবে চোখ রাঙ্গাইয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন যে সাহেব অধোমুখে অন্য বেঞ্চিতে যাইয়া বসিলেন। নিবেদিতা আমার কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নিকট নিজকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন;

ভারতবাসীদের সকলকে ভাই বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এইজন্য "ভগিনী নিবেদিতা" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশের লোকদিগকে পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

যে দিন আমার নিকট তিনি শুনিলেন, খড়দহে একদা ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ী বীরভদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে খড়দহে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে তাগাদা করিতে লাগিলেন। এই নেড়ানেড়ীরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়-পতাকা যখন বঙ্গদেশে হতশ্রী ও লাঞ্ছিত হয় এবং উক্ত ধর্ম্মের পাণ্ডাগণ যখন এতদ্দেশ হইতে পলায়নে-পর হন, তখন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী দুর্দ্দশা ও অধঃপাতের চুড়ান্ত সীমায় নীত হইয়াছিল। বিজয়দৃপ্ত হিন্দু সমাজ ইহাদের প্রতিকূলে একবারে দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলেন। এই পতিতের দলটিকে বীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আশ্রয় দান করেন। যে স্থানটিতে তাহারা শরণ প্রার্থী হয় এবং যে স্থানে দয়াল বৈষ্ণব-প্রভু শরণাগতদিগকে আশ্রয় দান করেন—সেই স্থানটিতে নেড়ানেড়ীদের কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি স্বরূপ প্রায় ৩৫০ বৎসর যাবৎ একটা বাৎসরিক মেলা বসিয়াছিল। অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ এই মেলাটি উঠিয়া গিয়াছে।

একদিন ফাল্গুন মাসের মধ্যাহ্নে নিবেদিতাকে সঙ্গে করিয়া আমি ও গণেন একখানি নৌকায় খড়দহে রওনা হইলাম। আমরা এইরূপ নৌকায় গঙ্গায় আরও দুই তিনবার পরিভ্রমণ করিয়াছি। খাওয়া দাওয়া ১০টার মধ্যে সমাধা করিয়া সন্ধ্যায় বাগবাজারে ফিরিয়াছি। খড়দহে যাওয়ার দিন তাঁর কি আনন্দ! আমাকে বলিলেন, "ও জায়গাটার নাম আমি কি দিয়াছি জানেন?—ওটা হচ্ছে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধিক্ষেত্র। ওরা মেলাটা তুলিয়া দিলেন কেন? এরূপ একটা ইতিহাস-বিশ্রুত ঘটনার

স্মারক উৎসবটাকে ও এইভাবে মাটি করিয়া ফেলাইতে হয়!" আমরা জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, সে গুলির সদ্ব্যবহার করিলাম। কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেই গঙ্গার হাওয়া জঠরানল উস্কিয়ে দেয়। আমরা জেলেদের ডাকিয়া ইলিস মাছ কিনিলাম। বেলা ৩টার সময় খড়দহের ঘাটে পৌছিলাম। একজন মেম সাহেব ও সঙ্গে দুই বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ঘাটে নৌকা লাগাইতে দেখিয়া কর্ম্ম-হীন পল্লীর লোকেরা কৌতুহলে মরিয়া যাইতেছিলেন। স্ফীতোদর লম্বিতোপবীত গোঁসাইর দল ঘাটে আসিয়া আমাদের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। নিবেদিতা আমাদিগকে পরিচয় দিতে মানা করিয়া দিয়াছিলেন—দর্শকেরা ভাবিয়া ছিলেন, আমরা নৌকা কয়েক মিনিট সেই ঘাটে রাখিয়া পুনরায় চলিয়া যাইব। কিন্তু সত্য অত্যই যখন নিবেদিতা তীরে পদার্পন করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে কথা বলিতে বলিতে আমরা গাঁয়ের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম, তখন পঙ্গপালের মত নিত্যানন্দ বংশীয়গণ ও অপরাপর লোকে আমাদের পেছনে পেছনে চলিলেন। এই অপূর্ব্ব শোভা-যাত্রা দেখিয়া নিবেদিতা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনুসরণ কারীদের মধ্যে কেউ কাসিয়া কাসিয়া মনোযোগ আকর্ষন করিতে লাগিলেন, কেউ লম্বোদরটি হেলাইয়া বক্র দৃষ্টিদ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন, কেউ গামছাখানি দিয়া মুখ মুছিয়া যৎপরোনাস্তি সাহসের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় ইনি কে?" সেই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য যেন তাঁহাদের জীবন মরণের সমাস্যার সমাধান আমি করিব, এই ভাবে সেই বৃহৎ জনতা উদ্‌গ্রীব হইয়া আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম। "উনি কে—উঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, উনি নিজের পরিচয়টা অপর হইতে নিজেই ভাল দিতে পারিবেন।" নিবেদিতা আমার উত্তর শুনিয়া এমনই গম্ভীর হইয়া গেলেন, যে কার সাধ্য তাঁহাকে

প্রশ্ন করিতে অগ্রসর হইবে? একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্যাম-সুন্দরের মন্দির কোথায়?" অমনই দশ বার জন লোক কৃতার্থ হইয়া এক-সঙ্গে উত্তর বলিতে লাগিলেন। কেউ হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক অঙ্গুলী দিয়া একেবারে উত্তরটি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন,—কেউ বা " আসুন্ আমাদের সঙ্গে" বলিয়া আমাদের পরিচালকত্বের সমস্ত গৌরবটা আত্মসাৎ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই আতিথ্যের অতিশয্যে আমরা কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলাম। শ্যামসুন্দরের মন্দিরসংলগ্ন নাট-মন্দিরে দাঁড়াইয়া যখন সোপানাবলীর উপর হ্যাটটি খুলিয়া রাখিয়া নিবেদিতা প্রণাম করিলেন, তখন সেই বৃহৎ জনতা মুগ্ধ ও বিমুঢ় হইয়া পড়িলেন। কেউ হিন্দুধর্ম্ম যে কত বড় তাহা বলিতে যাইয়া বাহুনাড়া দিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন, কাক বুক গর্ব্বে আধ হাত উঁচু হইয়া যেন ফুলিয়া উঠিল, কেউ বা কোন ধর্ম্মবিদ্বেষী যুবকের অনুপস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া "আজ যদি সে এখানে এই দৃশ্য দেখিত, তবে তাহার অসার যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইত" এবম্বিধ মন্তব্য প্রকাশ-পূর্ব্বক আনন্দোৎফুল্ল চক্ষে শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া তাঁহাদের অনুকূল ঘাড়-নাড়ায় তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। আমি এবং গণেন আমাদের বক্ষে সূত্রাকারে লম্বিত হিন্দুধর্ম্মের গৌরবের শুভ্র-মহিমা প্রকট করিয়া একেবারে মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। পুরোহিতকে কিছু দক্ষিণা দেওয়াতে তিনি এত আপ্যায়িত হইলেন যে তৎক্ষণাৎ আমাদের অনুরোধে নিত্যানন্দ প্রভুর হস্ত-লিখিত ভাগবত ও তাঁহার ভগ্ন যষ্টি আনিয়া দেখাইলেন, আমরা তাহা লইয়া আসিয়া নিবেদিতাকে সেই মন্দিরের বাহিরে দেখাইলাম। পুঁথি ও লাঠির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তিনি পাঁচটি টাকা দক্ষিণা দিলেন। পুরোহিত আনন্দে গদ্‌গদ্ হইয়া একটি 'শিরোপা' আনিয়া নিবেদিতাকে মাথায় ধারণ করিতে বলিলেন। তখন হ্যাটটি হাতে লইয়া ভগিনী নিজের

শিথিল কবরী ও সিঁথির মুল পর্য্যন্ত জড়াইয়া রক্ত বস্ত্রটি ধারণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা তখন আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এই শিরোপা (রক্ত বস্ত্র-খণ্ড) অতি মূল্যবান পদার্থ। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের এই শিরোপা মাথায় পরিতে পারিলে এক কালে রাজারাও ধন্য হইতেন, আমরা আপনাকে কম গৌরব দিলাম, মনে করিবেন না, এটা একটা মস্ত বড় গৌরব। তবে আপনি কে এইবার পরিচয় দিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন।" তাঁহার ইঙ্গিতে আমি ও গণেন বলিলাম "ইঁহার অপর পরিচয়ে আপনারা কি চিনিবেন? ইনি জনৈক ইংরেজ মহিলা, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণের মঠে আশ্রয় লইয়াছেন।" একজন বলিলেন "তবে কি ইনি নিবেদিতা?" তখন আর গোপন করা চলে না। হিন্দুর দলের কারু কারু চোখে জল আসিল, কেউ বা ভক্তিতে গদ্‌গদ কণ্ঠ হইলেন, কেউ বা দুই হাত জোড় করিয়া নিবেদিতাকে নমস্কার করিলেন। নিবেদিতা সবিনয়ে বিদায় চাহিলে পুরোহিত বলিলেন—"সেও কি হয়? প্রসাদ পাইয়া যাইতে হইবে।" খানিক পরে রসগোল্লার এক বিরাট ঠোঙ্গা উপস্থিত হইল, তাহারা নীচু হইতে অজস্র রস বাহকের গায়ে পড়িয়া তাহাকে রসিক করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা দুইজনে বেশ উদর পূর্ত্তি করিয়া খাইলাম। ভগিনী একটি খাইয়া অব্যাহতি পাইলেন না, নানারূপ মিশ্রকণ্ঠের অনুরোধ সমবায়ে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে আর একটি খাইতে হইল। বেলা শেষে আমরা নেড়ানেড়ির মেলার জায়গাটা দেখিলাম— নিবেদিতা সেইখানে বসিয়া অনেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সেই মেলা সম্বন্ধে কতকগুলি নোট লিখিয়া লইলেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ ছিল, এই বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধি ক্ষেত্র দর্শন সম্বন্ধে আমি একটি সন্দর্ভ লিখিব; তখন তিনি সেই নোট গুলি আমায় ব্যবহার করিতে দেবেন। আজ

বহু বৎসর পরে সেই সন্দর্ভ লিখিলাম, কিন্তু সে নোটগুলি আর পাওয়ার কোন সুযোগ হইল না।

সন্ধ্যাকালে ইলিস মাছগুলি নিবেদিতার ভৃত্য রামলালের হাতে দিয়া আমরা বাগবাজারের ঘাটে উঠিয়া সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনা করিতে করিতে যাইতেছি, এমন সময় একটা সাজিতে কতকগুলি মেটে পুতুল লইয়া একটা ফেরীওয়ালা বিক্রয় করিতে যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং পুতুলগুলি দেখিয়া আনন্দে একবারে আত্মহারা হইলেন। পুতুল তিনটি এক পয়সায় বিক্রী হয়,হলুদে আর কালো রঙ্গে রঞ্জিত, স্ত্রীমুর্ত্তি মাথায় একটা খোপা ও জগন্নাথের হাতের মত ছোট অর্দ্ধ-সমাপ্ত দুইখানি হাত, সেই হস্তদ্বয় হইতে স্তনদ্বয় বড়,পায়ের জায়গাটা মৃত্তি-কায় গড়া শিবলিঙ্গ অথবা বেতের মোড়ার মত। এরূপ পুতুল তো শত শত অলি গলিতে পাওয়া যায়, বঙ্গের এমন বালক বালিকা বোধ হয় নাই যাহারা এরূপ পুতুলের দশ বিশটা শৈশবে না ভাঙ্গিয়াছে। এই পুতুল হাতে লইয়া "oh most wonderful" (অতীব আশ্চর্য্য) ক্রমা-গত এইরূপ প্রশংসোক্তি করিতে লাগিলেন, আমি বলিলাম "একবারে ক্ষেপে গেলেন না কি ? এ গুলির ভিতরে কি পেয়েছেন যে রাস্তায় দাঁড়াইয়া এরূপ কচ্ছেন ? এখুনি আবার খড়দহের মত এখানে ভিড় জমাবেন, দেখ্‌ছি।' নিবেদিতা আমার কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল "অতি আশ্চর্য্য, অতি অদ্ভুত, অতি সুন্দর" এইরূপ মন্তব্য উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করিতে করিতে এক টাকায় সেই সমস্তগুলি পুতুল কিনিয়া রামলালের হাতে দিলেন। তারপর আমি বিদায় লইলাম।

পরদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পুতুলগুলি লইয়া কাল ওরূপ করেছিলেন কেন ?" তিনি বলিলেন—"আপনিও বুঝবেন না, ওর মত সুন্দর ও আশ্চর্য্য জিনিষ আমি ভারতবর্ষে দেখি নাই।" এই

বলিয়া অতি লুব্ধ চক্ষে তাহার একটী হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহাকে বাড়াইবেন, তাহার মাথা আকাশে না ঠেকাইয়া ছাড়িবেন না। আমি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু তিনদিন পরে মেজাজটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল, সেদিন হাসিয়া বলিলেন—"দীনেশ বাবু ওই পুতুল আমার এত ভাল লেগেছে কেন, শুনবেন? ৩০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বের অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বের অনেকগুলি জিনিষ সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে লইয়া আসিয়াছেন। আমি এবার বিলাত যাইয়া সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, সেই সংগ্রহের ভিতর অবিকল এই পুতুলের মত পুতুল দেখিয়া আসিয়াছি।"

নিবেদিতা কালীমন্দির দেখিলেই প্রণাম করিতেন, Mother Kali নামক পুস্তকে রামপ্রসাদের গানের যে বিশ্লেষন করিয়াছেন, তাহা শাক্ত লেখকেরই ভক্তির অর্ঘ্য স্বরূপ। কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃপুরের একটা কথা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন। "আপনি কি সত্যই ভগবানকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারেন?" আমি বলিলাম "কেন পার্‌ব না? তিনি পিতা, তিনি মাতা, এ আমাদের মুখের কথা নহে। মাতৃ স্তন্যপানের সঙ্গে আমরা ভগবানের মাতৃত্ব উপলব্ধি করিয়া বড় হইয়াছি, কালী মন্দিরে যাইয়া যখন মা 'মা' বলিয়া প্রণাম করি—তখন আমরা কপটতার অভিনয় করি না।" তিনি বলিলেন "দেখুন, এই খানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনের তফাৎ, আমি কিছুতেই মনে মনে ভগবানের মাতৃভাব উপলব্ধি করিতে পারি না। তাঁহার পিতৃত্বই আমাদের চিরাগত সংস্কার।"

এই সময় অর্থাৎ যখন মৃত্যুর যাত্রী হইয়া তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দারজিলিং যাইবেন, তাহার দুই মাস পূর্ব্বে, তিনি আমার নিকট হইতে

একটি প্রস্তরময় "প্রজ্ঞাপারমিতার" বিগ্রহ চাহিয়া লইয়াছিলেন—আমি বলিয়াছিলাম, "এ মূর্ত্তি আপনাকে দিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি, আপনি এটি না নেন—ইহাই আমার ইচ্ছা।" তিনি বলিলেন "আমি আপনার মত ঐতিহাসিকের মুখে দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করি না।" একরূপ জোর করিয়া সেই মূর্ত্তি লইয়া গিয়া তাহার পশ্চাৎভাগ একটা কুলঙ্গীর সঙ্গে তিনি গাঁথিয়া ফেলিয়া অতি যত্নে পুষ্প ও ধূপ দীপ দিয়া প্রত্যহ তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভীত কণ্ঠে ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, "এ মূর্ত্তি আপনি এখনই লইয়া যাউন, এবং আমাকে রক্ষা করুন, যে দিন হইতে এই মূর্ত্তি এই গৃহে আসিয়াছে, সেইদিন হইতে নিবেদিতার যে কত অশান্তি ঘটিয়াছে তাহা আর কি বলিব? মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে শান্তি দিয়াছে মাত্র।" আমি বলিলাম "কেন? এ মূর্ত্তি তো তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম—তাঁহাকে পাঠাইয়া দিন।" ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন "ব্রাহ্ম হইলে কি হইবে! তাঁহারা কিছুতেই এ মূর্ত্তি নিতে সম্মত নহেন।" ক্রিশ্চিয়ানা এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে এরূপ ভয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আমি বিগ্রহখানি রাখিবার অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

দারজিলিঙ্গ যাওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার ইংরাজীতে লিখিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া আসিল, আমি তাহার দুই খানি তাঁহাকে দিলাম। ভূমিকায় তাঁহার নাম না প্রকাশ করার জন্য তিনি আমাকে বাধ্য করিয়াছিলেন,—পুস্তক পাইয়া যে তিনি কত রূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব।

তাঁহার শেষ কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। একটু করুণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"এই বই উপলক্ষে বহুদিন আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশিয়াছি, দুইজনে একত্র হইয়া খাটিয়াছি। এখন কাজ শেষ হইয়া

গিয়াছে, আর বোধ হয় আপনাকে তেমন ঘন ঘন পাইব না। কিন্তু যে সৌহার্দ্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আপনি ভাঙ্গিবেন না, আপনি যদি পুর্ব্ববৎ না আসেন, তবে আমি কষ্ট বোধ করিব।" বস্তুতঃ তাহার ভগিনী জনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান ও প্রীতিকর ছিল, তাহা আর কি লিখিব ! যে দিন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম সে দিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া তিনি অনেক কবিকেই তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসা দিতেন—কিন্তু তিনি নিধুবাবুর গানের যত প্রশংসা করিতেন, এত আর কাহারো নহে, রামপ্রসাদ কি চণ্ডীদাসের ও নয়।

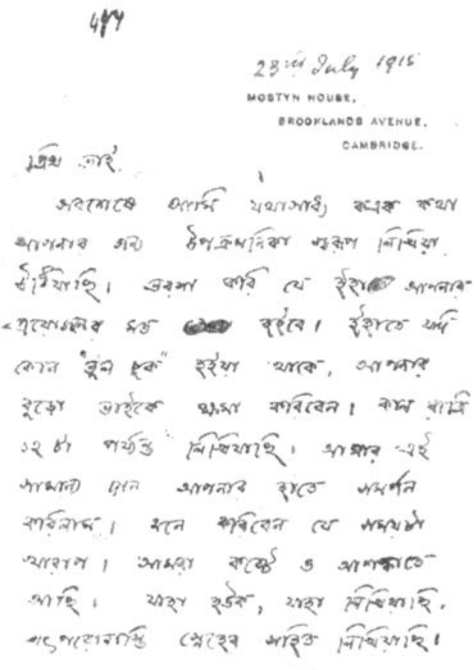
কলিন, সি, গ্যালিলাণ্ড এবং জে, ডি, এণ্ডারসন

সৌভাগ্যবশতঃ আমি আমার স্বদেশীয় বন্ধুদের মত—অনেক পদস্থ ও মনস্বী য়ুরোপীয় বন্ধু পাইয়াছি, তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য আমার গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। আমার এক অতি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, কলিন,সি,গালিলাণ্ড, তিনি "সিটি অব গ্লাস গো" এবং "লণ্ডন ল্যাঙ্কেসায়ার" বীমা কোম্পানির বড় সাহেব ছিলেন। মাসিক আয় ছয় সাত হাজার টাকা ছিল। কলিকাতা ইংরেজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা ছিল। ছোটলাট বাহাদুর যে সভার সভাপতি ছিলেন, স্কট বনিক কুলের সেই সভার পরবর্ত্তী সভাপতি হইয়াছিলেন গালিলাণ্ড সাহেব। তিনি আমাকে সহোদরের মত ভালবাসিতেন, একবার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "না তা, কিছুতেই হইবে না, আমি তোমাকে 'রায় সাহেব' লিখিতে পারিব না, তা হইলে তুমি পর হইয়া যাইবে।" *

তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত গিয়াছেন, গত মেলে তাঁর একখানি টাইপ করা চিঠি পাইয়াছি, তাহা এত বড় যে আমার তা পড়িতে প্রায় একঘণ্টা লাগিয়াছে, পত্র একখানি পুস্তিকা বিশেষ,—একজায়গায় লিখিয়াছেন "আমি ৩২ বৎসর ভারতবর্ষে ছিলাম, ইহার মধ্যে বহু ভারতীয় বন্ধু জুটিয়াছিল, কিন্তু গিরিশ ও তাহার মাসতুত ভাই দীনেশের মত এমন অন্তরঙ্গ কেহ হয় নাই।" (†) "তাঁহাদের দেশের জড়বাদী সভ্যতার

* No, not "Rai Saheb" that would be foreign to me."

† "I counted, in my 32 years of Indian experience many Indian friends, but there were none like Girish and his cousin Dinesh."


454

23rd July 1915

MOSTYN HOUSE,
BROOKLANDS AVENUE,
CAMBRIDGE.

প্রিয় ভাই,

অবশেষে আমি যথাসাধ্য কতক কথা
আপনার জন্য উপক্রমণিকা স্বরূপ লিখিয়া
দিয়াছি। ভরসা করি যে ইহা আপনার
প্রয়োজনের মত হইবে। ইহাতে যদি
কোন "ভুল চুক" হইয়া থাকে, আপনার
বুড়ো ভাইকে ক্ষমা করিবেন। কাল রাত্রি
১২টা পর্য্যন্ত লিখিয়াছি। আমার এই
সামান্য দান আপনার হাতে সমর্পণ
করিলাম। মনে করিবেন যে সময়টা
খারাপ। আমরা কষ্টে ও আশঙ্কাতে
আছি। যাহা হউক, যাহা লিখিয়াছি,
সাধ্যানুসারে স্নেহের সহিত লিখিয়াছি।

আপনার চিরবন্ধু
J.D. Anderson

ডাঃ জে, ডি এণ্ডারসন সাহেবের লিখিত
বাঙ্গালা চিঠি।

নিন্দা করিয়া এবং আমাদের সাত্বিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে বহু বিতর্ক করিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"সে ছিল আমাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণত্ব দেখাইবার এক মহাসমর ক্ষেত্র, কিন্তু সেই যুদ্ধ কি তৃপ্তিদায়ক ছিল! তাহাতে আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিতাম। আমি তোমাকে সরল ভাবে বলিতে পারি যে আমা অপেক্ষা তোমার গুণানুরক্ত বন্ধু নাই। (*)সে সকল দিন তখন মহার্ঘ বলিয়া মনে করা হয় নাই, কিন্তু এখন মনে সাধ হয়,সেরূপ জীবন যদি আবার পাইতাম! তার মত সুখকর সময় আমাদের জীবনে বোধ হয় নাই।" "তোমাকে এবং তোমার মত আর কয়েকজন বন্ধু না পাইলে হয়তঃ আমার জীবনের এরূপ সফলতা হইত না, অন্তর থেকে এই কথাগুলি বল্‌ছি,ঠিক জানিও।"(+) আমি রোগের শয্যায় কতদিন এই সহৃদয় বন্ধুকে আমার শয্যার পার্শ্বে পাইয়াছি! এমন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অহংকার বা ইংরেজ সুলভ গর্ব্ব কিছুই ছিল না। ৩২বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াও বর্ণ-বৈষম্যের অহংকার তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ অরিতে পারে নাই, ইহা হইতে তাঁহার খাঁটী মনুষ্যত্ব প্রমাণ করিবার আর কি থাকিতে পারে।

---

*. "It was a great battle of wits, at times, but it was all so represhing, and we won each others esteem and regard...I can assure you, that you have no sincerer admirer than myself."

†. "Without you an men like you Dinesh, I would not be where I am today *and that is sure*"

কিন্তু ইহাঁর সঙ্গে তো বহু বৎসরের আলাপ পরিচয় ছিল। কিন্তু যাঁহাকে চোখে দেখি নাই, যাঁহার মুখের কথা কানে শুনি নাই, তিনি কি করিয়া সহোদরাধিক বন্ধু হইতে পারেন? অথচ অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান,—চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার, কেম্ব্রিজের বাঙ্গলার অধ্যাপক ডাঃ জে, ডি, এণ্ডারসন আমাকে না দেখিয়াও আমার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, যাহার দৃষ্টান্তে পৃথিবীতে বিরল। আমার ইংরেজী বাঙ্গলা বইগুলির সামান্য গুণ ইনি এত বাড়াইয়া দেখিতেন, যে তাঁহার প্রশংসোক্তিতে আমি অনেক সময় লজ্জিত হইয়া পড়িতাম। এণ্ডারসন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যখন শিশু তখন সিপাহী যুদ্ধের হাঙ্গমা হয়। তাঁহার মাতাও তাঁহার শৈশবাবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করেন। পিতা একটি হিন্দু আয়া ও হ'রে নামক বাঙ্গালী চাকরের উপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া মিউটনি সংক্রান্ত কাজে চলিয়া যান। হ'রে তাঁহাকে ভূতের গল্প শুনাইত, তিনি ভয়ে চক্ষু বুজিয়া শুনিতেন কিন্তু নেটের মশারির ভিতরে গেলে মনে করিতেন, ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে ভূত প্রেত প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রায় ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন, ইংরেজী জানিতেন না, একখানি পত্রে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে এই কয়েক বৎসরের প্রভাব জীবনে এটা বেশী হইয়াছিল যে ইংরেজীর উচ্চারণ বাঙ্গালীরা যেভাবে করিয়া থাকে আমি এখন পর্য্যন্তও কোন কোন শব্দ সেই ভাবে উচ্চারণ করিয়া ধরা পড়িয়া যাই। সেই প্রভাব হইতে এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত ডোনাল্ড ফ্রেজার (এখন রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) আমাকে লিখিয়াছেন "একবার শিশু এণ্ডর্সনের জ্বর হইয়াছিল, তখন হিন্দু আয়া কালীঘাটে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বলি-দেওয়া পাঁঠার রক্তে তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিয়াছিল, তাহাতেই নাকি

তাঁহার জ্বর সারিয়া যায়। * এণ্ডার্সনের মত বহুভাষাজ্ঞ ব্যক্তি য়ুরোপেও খুব বিরল। তিনি ভারতবর্ষীয় বহু ভাষা জানিতেন; মেচ, টিবেটান, অহম্‌দের ভাষা, আকা ভাষা, টিপ্রাভাষা, প্রভৃতি বহু ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল; তাহা ছাড়া সংস্কৃত, হিব্রু গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতিতেও তাঁহার আশ্চর্য্য দখল ছিল। বিলাতী বড় বড় সমস্ত পত্রিকার তিনি রীতিমত লেখক ছিলেন এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে এক-খানি পুস্তক রচনা করেন। কেম্বিজ ইউনিভার্সিটি আধুনিক ভাষা সংক্রান্ত একটা নূতন সিরিস প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এণ্ডার্সনের বাঙ্গলাভাষার বইখানি দিয়া এই সিরিসের মুখপাত করা হইয়াছে। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি "ঘুমের ব্যারামে" আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

প্রথম পত্র-ব্যবহারের পরই তিনি আমার ইংরেজীতে লিখিত "বঙ্গ-ভাষার ইতিহাস" খানি সম্বন্ধে লিখিলেন "ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয়গুলি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে গভীর শ্রদ্ধার সহিত আপনার সমক্ষে তাঁহাদের টুপি নামাইতে বাধ্য হইবেন" †

ফ্রেজার সাহেব লিখিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি তাঁর এতই প্রাণের টান ছিল, যে বিশাল নদনদী-বেষ্টিত ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের কথা উঠিলে তিনি আর জীবনে তাহা দেখিতে পাইবেন না, এই আক্ষেপে তাঁর চক্ষে জল আসিত। এণ্ডারসন "ব্রহ্মপুত্রের স্নানে"র সময় একবার তেজপুরে ছিলেন, তখন একটি বৃদ্ধব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁহাকে অপরাপর যাত্রীর সঙ্গে স্নান

* "He got ill—The Ayah took him to Kalighat, a goat was decapitated, he was smeared with blood, and *Mantras* were recited. He recovered".

†. All students of Indian subjects must take off their hats to you with profound respect."

করাইয়া দিয়াছিল। তিনি বহু কষ্টে একজন চাকরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া 'আকা'ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সরকারের নিকট ঐ ভাষায় পরীক্ষা দিতে আবেদন করেন। সেই ভাষাবিৎ আর কেহ না থাকাতে তিনি নিজেই সরকার কর্ত্তৃক পরীক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া নিজের পরীক্ষা গ্রহণ এবং তদনন্তর পারিতোষিক লাভ করেন। * তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এতটা ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে একবার নদীয়ার এক বুড় উকিলকে তিনি ভুল বাঙ্গালায় সওয়াল জব করায় অপরাধে জরিমানা করিয়াছিলেন। † তিনি একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন"আপনার বই পড়িলে আমার নিজকে ক্ষুদ্র এবং অজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইন্দুর ও সিংহকে সাহায্য করিয়াছিল —এটি জানবেন, অন্ততঃ আমি আপনার বইএর প্রচারের পক্ষে কিছু সাহায্য করিতে পারিব।" ‡

---

* "When he had learnt this language, he reported to Government his desire to take an examination in it. Government asked him to name an examiner. He replied there was no one to examine. So he was told to set himself an Examination paper. He submitted such a paper to Government. It was approved. He then answered it and corrected it and had a *viva voce* with an Aka and passed himself. Then he drew his reward. Such was his story. I do not vouch for its accuracy or my memory of exact details."

† "In Nadia he fined an old pleader for careless Bengali in pleading."

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাই আমরা ক্রেজর সাহেবের পত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

‡ "Your book makes me feel humble and ignorant But the mouse helped the lion, you know, and I may at least be able to make your work known over here."

আমার "মধ্য-যুগের বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য" নামক ইংরাজী পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম। তখন ঘোর যুদ্ধানলের আহুতি-স্বরূপ ইংরেজ পরিবারের বহু পুষ্পতুল্য সুকুমার জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে উৎসর্গীকৃত হইতেছিল। এণ্ডার্সনের এক পুত্র যুদ্ধে নিহত হন, এবং অপরাপরেরা রণক্ষেত্রে ছিলেন। আমার পাণ্ডুলিপি পাইয়া তিনি লিখিলেন, "যদি অবস্থাচক্রে আমার সাহসে কুলায়, তবে এই বইখানির একটি ছোট ভূমিকা আমি লিখিব—সেই ভূমিকায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব—কিজন্য আপনার সমস্ত পুস্তকের একজন রীতিমত পাঠক মনে করেন যে এই বই খানি শুধু কলিকাতায় নহে, লণ্ডনে এবং প্যারিশে, অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজে সর্ব্বত্র অধীত হওয়ার জিনিষ হইয়াছে। আমি এই পুস্তক অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি ও করিতেছি, ইহা হইতে অনেক অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং আদ্যন্ত অনুরাগের সঙ্গে পড়িয়াছি। যে ভয়ানক সময়ে বহির্দ্বারে একটু কড়া নাড়িলে, কোন চিঠি আসিলে— আশঙ্কায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, যখন ভয়ানক দুঃখ ও ভয়ে আমরা অভিভূত হইয়া আছি, এই সময়েও আপনার এই চমৎকার পাণ্ডুলিপি পড়িয়া সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিতেছি, ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারেন, আপনার বইখানির বিষয় ও রচনা পদ্ধতি কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমি আপনার অতি চমৎকার বইখানি ফিরিয়া পড়িবার ব্যস্ততায় এই পত্র খানি অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে সারিলাম।" †

---

† I propose to send with it, if circumstances leave me the courage to write it, a short preface explaining why in the judgment of a very old student of all your works, your book should be read not only in Calcutta but in London and Paris and Oxford and Cambridge.

আমার লেখার প্রতি তাঁর এতই অনুরাগ ছিল যে ইংরেজী বাঙ্গালা যাহা কিছু লিখিতাম, তারই অশেষ সুখ্যাতি করিতেন। প্রীতির রঙ্গিন চসম পরিয়া তিনি আমার লেখা গুলি পাঠ করিতেন,সেই প্রীতিই আমার সামা রচনায় সৌন্দর্য্য আবিষ্কারের যাদু-কাঠি ছিল; শুধু আমার ইংরেজী বই নয় বাঙ্গলা লেখা গুলিও আদ্যন্ত অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন মদ্রচিত সতী পড়িয়া লিখিয়াছিলেন—"আমার সব চাইতে একটি বিষয় খু ভাল লেগেছে, ফরাসী লেখক জুলে লিমেটার যেরূপ প্রাচীনতম কথা গুলি ও সেমিটক জাতীয় পৌরানিক কাহিনী নূতন সাজে সাজাইয়া বাহি করিয়াছেন, আপনি ও অবিকল সেই ভাবে প্রাচীন উপকথা গুলি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন। সেই প্রাচীন কথা-সাহিত্য c সর্ব্বসময়ে চিন্তাক্লিষ্ট মানব-চিত্তকে সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তৎসম্বন্ধে উক্ত ফরাসী লেখকের মতই আপনার সরল বিশ্বাস লিমেটারের ন্যায় রহস্য-প্রিয়তা ও আপনার লেখার বিশেষ একটা গুণ যে স্থানে আপনি তরুণ-বয়স্কা দেবীদের আড়ম্বর প্রিয়তা, ও সতীর রুদ্রা বলয় ও বল্কল-বাসের প্রতি অবজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছেন, সে জায়গা আমার চমৎকার লাগিয়াছে। আপনি কি জানেন যে প্রশান্ত মহা সাগরের দ্বীপপুঞ্জের সুন্দরী মেয়েরা এখনও অতি মনোরম বল্কল-

---

I have read it and am reading it with great delight an profit and very real sympathy. Think how grea must be the charm of your topic and treatment when i this fearful year of anxiety and sorrow, the reading o your delightful Ms. has given me rest and refreshment a a time when every post, every knock at the door ma bring us sorrow. I write this in frantic hurry in orde

বাস পরিয়া থাকেন ? সে গুলি তাহাদেরে চমৎকার মানায়।" * আমার নীলমাণিক নামক গল্পের বইখানি পড়িয়া তিনি ১৬ পৃষ্ঠার এক চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে প্রশংসার অবধি ছিল না। তিনি মনে করিতেন, নীলমানিকে আমি আমার নিজের চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া দিয়াছি। † ঐ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছিলেন, "সুন্দরী, জেদপরায়ণা দুর্ভাগা এবং বিপথগামিনী রাণী চরিত্রের শেষ সংশয়ের মত করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী লেখা আমি বহুদিন পড়ি নাই। ‡

---

o go back to your most interesting and fascinating pages."

* But what interests me most is the fact that you etell the story in exactly the same fashion as Jules Lemat-e tells the ancient legends of classical antiquity and of the Semetic East, with a pious delight and belief in their charm nd beauty, and power to give solace to the poor puzzled mortals. Like M. Lematre our tale has the additional delight of humour. That is a very delightful passage in which your little goddesses shew off their jewels and lough at Sati's bark-dress and *rudraksa* bracelet and do you know that in the Pacific islands the pretty girls still wear the most lovely bark-dresses which are extremely becoming ?"

† "There is an element of self-portraiture in your very vivid picture of Nilmanik."

‡ As for poor little Rani, wiiful, beautiful erring, unhappy, that scene of the poor girl's death is one of the most touching and significant things I have read for many a long day."

একদা নিউনহাম কলেজের দুই শত মহিলার নিকট তিনি আমার "সতী" গল্পটী পড়িয়া তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং 'এসিয়াটীক কোয়রটারলি, পত্রিকায় ঐ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া আমার একটি জীবনী প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিলাত-প্রত্যাগত অনেক ভদ্র লোকের নিকট শুনিয়াছি, তিনি আমার সম্বন্ধে সকলের নিকট এত উচ্চ প্রশংসা করিতেন, যে তাঁহার শ্রোতৃবর্গ আমার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের খুব বেশী একটা মূল্য দিতে চাহিতেন না, তাঁহাকে আমার পক্ষপাতী বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন।

আমাকে তিনি বহু পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেকের বেশী হারাইয়া গিয়াছে। আর যাহা আছে, তাহা আমি বাঁধাই করিয়া রাখিয়া দিয়াছি, তাহা প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠা হইবে। এই সকল পত্রে রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানারূপ আলোচনা আছে। একবার ইউরোপীয় নীতি-মূলক ধর্ম্ম ও আমাদের ভক্তিবাদ নিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার খুব বিতর্ক চলিয়াছিল। ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া তিনি ঐশ্বরীক বিধানের সততা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্যায়ান্যায় ও ধর্ম্মাধর্ম্মের উর্দ্ধে যে একটা ভগবৎ লীলার জগৎ আছে, নীতিজ্ঞের সূক্ষ্ম বিচারে যাহা আয়ত্ব করা যায় না, যাহা সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল ভক্তের একান্ত আশ্রয় ও সান্ত্বনার চরম স্থল—সেইটি তিনি স্বীকার করিতে চান নাই, অথচ প্রতিপক্ষের মতের উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্গভাষা তিনি প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত একথা স্বীকার করেন নাই,—তাঁহার বিশ্বাস ছিল আর্য্য-উপনিবেশের পূর্ব্বে এদেশে তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষামূলক এক প্রকার অনার্য্য ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই মূল ভাষার উপর প্রথম প্রাকৃত তৎপরে সংস্কৃত ভাষার অভিধান আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষা ও ফরাসী ভাষা তিনি একরূপ বলিয়া মনে করিতেন। ফরাসী ভাষা গ্যালিক ভাষার

ভিত্তির উপর ল্যটীন ভাষার আভিধানিক ঐশ্বর্য্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিনি মনে করিতেন বদো, মেচ্, কাছাড়ি ও মণিপুরী ভাষার চিহ্ন যদিও বাঙ্গলা ভাষায় এখন ততটা দেখা যায় না—যেহেতু প্রাকৃত-অভিধান অগস্ত্যমুনির ন্যায় সেই পুরাতন অনার্য্য ভাষাটাকে একেবারে গণ্ডুষ করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—তথাপি খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বঙ্গলা ভাষায় সেই অনার্য্য ভাষার সুরটি পাওয়া যাইতে পারে,। এই সংমিশ্রনে বাঙ্গলা ভাষা তাহায় অসামান্য ক্ষিপ্রগতি, কোমলতা ও সর্ব্বতোমুখী প্রকাশ-শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। তিনি 'বদে' ভাষা হইতে অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত ভাষায় প্রচলিত বহুল অসমাপিকা ক্রিয়ার ভঙ্গীটি এখন ও বঙ্গভাষার ভিত্তি মূলে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—উদাহরণ স্থলে তিনি এই ছত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,"আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব।"—অসমপিকা ক্রিয়া-বহুল এই প্রকার কথার বিন্যাশ সংস্কৃত বা প্রাকৃতে দৃষ্ট হয় না; 'বদো' প্রভৃতি ভাষায় এই ভাবের রচনা পাওয়া যায়। তিনি হিন্দী ও ইংরেজীতে শব্দের উপর জোর দেওয়াটা ঐ ভাষাগুলির বিশেষ লক্ষণ মনে করিতেন —এবং ফরাসী ও বাঙ্গলায় একটা পূর্ণ বাক্যাংশের উপর জোর দেওয়ার প্রণালীর প্রতি বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ঐ word-stress এবং phrasal accent এতদুভয়ের লক্ষণ লইয়া তিনি অনেক দীর্ঘ চিঠি আমায় লিখিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ তাঁহার চিঠি গুলি এত বিভিন্ন বিষয় লইয়া গবেষনার উপাদান প্রদান করিতেছে, যে সেগুলি প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হওয়ার যোগ্য—সেগুলি একজন আজন্ম সাহিত্য-সেবীর সরল প্রাণের উপহার—অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন, এবং তাহার সহৃদয়তা ও সৌহার্দ্দ্যের খনি-স্বরূপ—হাতের লেখাগুলি ঠিক মুক্তার ন্যায়। আমি ভূল করিলে তিনি সহৃদয়তার

কৌশলে আমাকে কি ভাবে সংশোধন করিয়া দিতেন, তাঁহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি কয়েকবার তাঁহার নিকট লাল কালীতে চিঠি লিখিয়াছিলাম, বোধ হয় চিঠি-পত্রে লালকালী ব্যবহার ইংরেজী কায়দা-বিরুদ্ধ। আমাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতে-ছিলেন, অথচ আমি যখন ক্রমাগতই লাল কালী চালাইতেছিলাম, তখন আমাকে উৎসাহ দেওয়া কিছুতেই তাঁহার পোষাইতেছিল না—এটা বুঝিতে পারিলাম। তিনি একখানি চিঠি এই ভাবে সুরু করিলেন, "লাল কালীতে লিখিলাম, ক্ষমা করিবেন,কি করিব? ছেলেদের খাতা সংশোধন করিতে-ছিলাম,একটি ছেলে আমার কালো কালীর দোয়াতটা লইয়া পলাইয়াছে।"*

তাঁহার সঙ্গে পত্রব্যবহারের এক বৎসর পরে তিনি আমাকে একখানি চিঠিতে লিখিলেন—"আমি আপনাকে আর "মিষ্টার সেন" বলিয়া সম্বোধন করিতে চাই না "মিষ্টার" কথাটা ছাড়িয়া দিতে চাই, আপনি কি বলেন? আপনি ও আমাকে আপনার প্রবৃত্তি হইলে শুধু "এণ্ডারসন" বলিয়া সম্বোধন করিবেন।" † পরে তিনি চিঠি গুলিতে "ভাই আমার" কথাটা বাঙ্গলায় লিখিয়া ইংরেজীতে আর সব কথা লিখিতেন। কখনও কখনও ইংরেজী পত্রের নিম্নে এণ্ডারসন না লিখিয়া "ইন্দ্রসিংহ" লিখিতেন। আমি একবার লিখিয়াছিলাম, আপনি 'ইন্দ্র সিংহ' না লিখিয়া "ইন্দ্র সেন" লিখুন না কেন? তাহা হইলে আপনি ঠিক আমাদের আত্মীয় হইয়া দাঁড়াইবেন, তা ছাড়া Anderson এর son এর সঙ্গে "সিংহ"অপেক্ষা "সেনের"সাদৃশ্য বেশী। ইহার পর হইতে তিনি পত্রে "ইন্দ্রসেন" বলিয়া অনেকবার স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

---

* "Excuse red ink ! I have been correcting exercises and one of the children has carried off the black ink-pot."

† "May I drop calling you "Mr. Sen" and will you, if you like, call me 'Anderson' without 'Mr. ?"

আমি তাঁহাকে যে সকল চিঠি লিখিতাম, তাহার প্রশংসা তিনি অনেকের কাছে করিতেন। ডাঃ তারাপুরওলার কাছে একখানি চিঠিতে আমার পত্রগুলি তাঁর নিকট কিরূপ ভাল লাগে তাহা লিখিয়াছিলেন, আমাকে একবার লিখিয়াছিলেন—"আপনাকে আমি কখনও চর্ম্মচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু এইটি আমার সান্ত্বনা যে অনেক সময় মুখের কথায় লোককে যা বুঝা যায়, চিঠিপত্রে তার চাইতে ঢের বেশী বুঝা যায়। আমি নিশ্চয়ই একটা বড় ভুল করিয়াছি যদি আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা ঠিক না হইয়া থাকে; আমি আপনার চিঠি পত্র পড়িয়া সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকি, যে আপনি একজন অতি উৎকৃষ্ট সহৃদয় ব্যক্তি।" * তাঁহার প্রীতি আমার সমস্ত ক্ষুদ্রতার উপর খুব বড় রংএ ফলাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র যুদ্ধে মৃত হন, আমি সান্ত্বনা দিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন "পত্রের গোড়াতেই আমি বলিতে চাই—এটি অত্যন্ত আন্তরিক এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যে পৃথিবীর সমস্ত স্থান হইতে আমাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের নিকট হইতে সান্ত্বনা-সূচক চিঠি পাইয়াছি, কিন্তু কাহারও চিঠিতে আপনার কথাগুলির অপেক্ষা আমরা বেশী সান্ত্বনা ও আন্তরিকতা পাই নাই।" †

---

* "It has always been something of a consolation to me for not having met you in the flesh that often a man's written style in his letters tells his temperament and character even better than his spoken words, and I am very much mistaken if my unseen friend Dinesh is not one of the kindest and best of men."

† "In the first place let me tell you. with the greatest earnestness and truly that of all the kind messages of sympathy and regret which has reached us from friends and relatives in all parts of the world, none has moved and comforted us more than your affectionate words."

আমি সমস্ত শোক দুঃখ বাসি ফুলের মত সরাইরা ভগবানের শ্রীচরণ-পদ্মে ভক্তি ও নির্ভরের নূতন ডালি উপহার দিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম।

তাঁহার শত শত পত্র হইতে আর বেশী কিছু উদ্ধৃত করিব না। তিনি সিলেট—হবিগঞ্জে প্রথম দাম্পত্য জীবন কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, খোয়াই (ক্ষেমঙ্করী) নদীর সংশ্রবে কতরূপ কবিত্বময় ভাবের উচ্ছাসে তাঁহার মন ভরপুর হইত, তাহা একখানি চিঠিতে অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রমাগত দুই মেলে আমার চিঠি না পাইলে তিনি সহোদরের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইতেন, আমার চিঠি জার্ম্মান ক্রুজারে নষ্ট করিয়া ফেলিল কিম্বা আমি হঠাৎ অসুখ করিয়া বসিলাম, এইরূপ নানারূপ দুশ্চিন্তাতুর হইয়া তিনি কত কি লিখিতেন! আমার স্নায়বীর দুর্ব্বলতা কিসে ভাল হইবে, সাত সমুদ্র তের নদী দূরে বসিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি সেই চিন্তা করিতেন,—শারিরীক ব্যায়াম কি ভাবে করা দরকার, কত বৈজ্ঞানিক মত খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই উপদেশ বাহির করিতেন এবং শরীর ও বয়সের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইতেন। গত ১৯২০ সালের ২৪এ নবেম্বর সাড়ে ছয়টার সময় তিনি স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্র-শোক ও অতিরিক্ত খাটুনিতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধের উপলক্ষে বহু ভাষায় অধিকার থাকার দরুণ, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনুবাদ-কার্য্যে বেগার খাটাইয়া ভগ্ন স্বাস্থ্যের যে টুকু ভাঙ্গিতে বাকী ছিল তাহার উপর শেষ আঘাত দিয়াছিলেন। অবশ্য স্বদেশে-প্রেম তাঁহাকে এই কার্য্য প্রণোদিত করিয়াছিল। অনেক ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছেন, তিনিও সেই যুদ্ধের জন্য খাটিয়াই প্রাণ দিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার য়ুরোপীয় বন্ধু বান্ধব ও সাহিত্যিক সুহৃদ্বর্গ এক বাক্যে বলিয়াছিলেন, যে বঙ্গদেশের—বঙ্গসাহিত্যের এরূপ প্রীতি-মূলক, এরূপ

গৌরবাত্মক এবং এরূপ বিজ্ঞজনোচিত সমালোচনা করিবার লোক বিলাতে আর কেহ নাই। যে দিন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছিলাম সে দিন আমি নিদারুণ পীড়ায় শয্যাগত,সেই দিন মনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছিল তাহার বেগ এখন ও থামে নাই। এখনও বিলাতী মেল আসিলে এণ্ডার্সনের পত্র না দেখিয়া হঠাৎ মনের প্রফুল্লতা সমস্ত চলিয়া যায়, নূতন বই প্রকাশিত হইলে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া কান্না পায়।

তিনি আমাকে অনেক গুলি চিঠি বাঙ্গলায় লিখিয়াছিলেন,তাহার বেশীর ভাগ বন্ধুবান্ধবেরা লইয়া গিয়াছেন, একখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

২৩শে জুলাই ১৯১৫

মষ্টিন হাউস, ক্রকল্যাণ্ড এ্যাভিনিউ, কেম্ব্রিজ—

প্রিয় ভাই,

অবশেষে আমি যথাসাধ্য কএক কথা আপনার জন্য উপক্রমণিকা স্বরূপ লিখিয়া উঠিয়াছি। ভরসা করি ইহা আপনার প্রয়োজনের মত হইবে। ইহাতে যদি কোন "ভুল চুক" থাকে, আপনার বুড়ো ভাইকে ক্ষমা করিবেন। কাল রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত লিখিয়াছি। আমার এই সামান্য দান আপনার হাতে সমর্পন করিলাম। মনে করিবেন যে সময়টা খারাপ। আমরা কষ্টে ও আশঙ্কাতে আছি। যাহা হউক, যাহা লিখিয়াছি, যৎপরোনাস্তি স্নেহের সহিত লিখিয়াছি।

আপনার চির বন্ধু

J, D, Anderson.

তিনি অনেকবার আমায় লিখিয়াছেন "সমস্ত পৃথিবীময় আপনার ইংরেজী পুস্তক গুলির অনুরক্ত এত লোক আছেন যে তাঁহাদের খবর আপনি কিছুই জানেন না।" এক সাহেব এরিওপ্লানে আকাশে ভ্রমণ করার সময় আমার পুস্তক পড়িয়া প্রীত হইয়াছিলেন-এবং এণ্ডারসনের

নিকট চিঠি লিখিয়া আমার সন্ধান লইয়াছিলেন—সে চিঠি তিনি আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর একবার আমার অসুখের সংবাদ শুনিয়া লিখিয়াছিলেন—"আপনি সাবধানে থাকিবেন, বাঙ্গলাদেশে ছুইটী দীনেশ নাই, পৃথিবীময় আপনার বন্ধু আছেন, আপনি যাঁহাদেরে জানেন তাঁহাদের চাইতে বেশী। তাঁদের সকলের জন্য আপনি আপনার জীবনটাকে যত্ন করিবেন, আমাদের সকলে নিকট আপনার জীবনের মুল্য খুব বেশী জানিবেন।" *

ভালবাসা একটা অসীম সামিগ্রী, ইহার চোখে পড়িলে কিছুই ক্ষুদ্র থাকে না। এণ্ডার্সন তাঁহার অসামন্য ভালবাসা দিয়া আমার মত সামান্য লোককে বাড়াইয়া গিয়াছেন। মরিবার একবৎসর পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি এণ্ডারসনকে 'ডিলিট' উপাধি প্রধান করিয়াছিলেন'। এই উপাধি পাইয়া তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন "আমা অপেক্ষা আপনি এই উপাধি পাওয়ার যোগ্যতর।"

---

* "You must be careful of yourself. There are not two Dineshes in all Bengal and for the sake of your friends all over the world more in number than yon know, you must take care of a life that is very valuable to us."

ইংরেজীতে লিখিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।

আমি ১৯০৭ সনে ইংরেজীতে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ইতিহাস রচনা করি। যাঁহারা এই বই দেখেন নাই, তাঁহাদের অনেকে মনে করিয়া থাকেন ইহা আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বাঙ্গলা গ্রন্থের ইংরেজী তর্জ্জমা। এই ধারণা একেবারে ভুল। দুই পুস্তকের বিষয়গত সাদৃশ্য অবশ্যই আছে, কিন্তু ইংরেজী বই সম্পূর্ণ নূতই প্রণালীতে লেখা। ইহার বিষয়-বিভাগ ও আলোচনা প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন। তাহা ছাড়া অনেক নূতন কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হইয়াছে যাহা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' নাই। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' যখন লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমি ২১।২২ বৎসরের নব-যুবক, আর ইংরেজী বই আমি আমার ৪০ বৎসর বয়সে লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম। সুতরাং ইংরেজী পুস্তকের বিষয় নির্ব্বাচনাদিতে কতকটা পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার পরিচয় থাকিবার কথা।

এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পরে য়ুরোপের বিখ্যাত পত্রিকা সমুহে যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয়—তাহা আমার পক্ষে খুব শ্লাঘনীয় হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে সার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন আমাকে লিখিয়াছিলেন, "বিলাতের টাইমস পত্রিকায় যদি আপনার কোন পুস্তকের সমালোচনা তিনটি ছত্রেও হয়, তবে সেটি একটা মস্ত বড় গৌরবের কারণ হইবে।" কিন্তু সেই সুবিখ্যাত টাইমস পত্রিকার আমার শুধু এই বইর নয়, মদ্‌রচিত আপরাপর অনেক পুস্তকেরই সুদীর্ঘ অনুকূল সমালোচনা বাহির

হইয়াছে, তাহার কোন কোনটী পূর্ণ দুই স্তম্ভ ব্যাপক এবং অপরাপর গুলির অধিকাংশই এক স্তম্ভের উপর। টাইমস লিখিয়াছিলেন, "ইংরেজী লিখিত পঞ্চাশ খনি ভ্রমণ বৃতান্ত পাঠ করিলে হিন্দুদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, এই এক খানি পুস্তক পাঠে তদপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞতা জন্মিবে, লোটির ত্রিবাঙ্কুরের মন্দির সম্বন্ধীয় কৌতূহল-প্রদ গ্রন্থ এবং মঃ সেভ্রিলনের হিন্দুধর্মের সম্বন্ধীয় বিরাট পল্লবগ্রাহিতা এই অনাড়ম্বর হিন্দুলেখকের পুস্তকে নিকট একান্ত হীন-প্রভ বলিয়া মনে হয়।" * সুপ্রসিদ্ধ এথিনিয়ম পত্রিকার মতে, "বঙ্গ সাহিত্যর মধ্য-যুগ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল তত্ত্ব দিয়াছেন, তাহা তাঁহার সময়কার অথবা কোন সময়ের কোন পুস্তকে প্রদত্ত হয়র নাই" † এবং স্পেকটেটর বলেন "বোধ হয় যে পরিশ্রম ও বিদ্যার ফলে এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে, তাহা অন্য কোন জীবিত গ্রন্থকারের নাই।' ‡ এইরূপ অতিশয়োক্তি পূর্ণ কত যে সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল,

* "He tells more about the Hindu mind than we can gather from 50 volumes of impressions of travel by Europeans. Loti's picturesque account of Travancore temples,and even M.Chevrillon's synthesis of much browsing on Hindu scriptures seem faint records by the side of this unassnming tale of Hindu Literature." Time's Literary Supplement, June 20, 1912.

† "In the middle age he has done more for the history of his national Language and Literature than any other writer of his own or indeed any time. Athenium,March 16,1912

‡ "Perhaps no other men living has the learning and happy industry for the task he has successfully accomplished" Spectator, June 12, 1912

তাহার সংখ্যা নাই। ফরাসী 'রিভিউ এসিয়াটিক' পত্রিকায়' ডেন্মার্কের বিজড্রজনে অবদি রয়েল ইন ষ্টিটিউট ফর ট্যাল নামক মাসিক পত্রে এবং জারমেনির ডিউটসি রাওস্যা প্রভৃতি য়ুরোপের সর্ব্ব প্রধান পত্রিকা-সমূহ পুস্তক খানিকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এই সকল সমালোচনার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে য়ুরোপের যাঁহারা প্রাচ্য বিদ্যার শিরোভূষণ তাঁহারই এই সকল সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। হলাণ্ডের সমালোচক ডাঃ কারণ (Dr Kern) তাৎকালিক প্রাচ্য প্রত্নতাত্বিকদিগের মধ্যে পূজনীয় ছিলেন। ইঁহার সম্মানের জন্য সমস্ত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ একসময়ে যে বিরাট অভিনন্দন পুস্তক সঙ্কলন করিয়া উপহার দিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত নামে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই পুস্তক খানির নাম "কর্ণপূজা"। ইনি আমার বই খানির অষ্টপৃষ্ঠা ব্যাপক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জারমনিতে সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃত-বিৎ পণ্ডিত ওল্ডেনবারগ সমালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ফরাসী দেশের রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটীর সভাপতি সেনার্ট এবং উদীয়মান প্রাচ্য-তাত্বিক জুলে ব্লক সুদীর্ঘ প্রশংশোক্তি পূর্ণ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। বিলাতের রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটীর জারনালে প্রবীন ঐতিহাসিক এইচ বিভারেজের সমালোচনা প্রকাশিত হয়, এবং ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রিকায় আমার সমালোচনা করিয়াছিলেন হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্বক বিচারপতি এবং অধুনাতন প্রত্ন-তাত্বিকগণের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক পারজিটার। ইহা ছাড়া শিল্পচার্য্য ই, বি, হাবেল, ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ, য়ুরোপীয় কলশিল্পের অগ্রণী রথেনষ্টাইন, প্রত্নতত্ত্ববিৎ র‍্যাপসন, বারনেট, হুলজ্, ব্লুমহার্ডট,প্রেসেডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্বে অধ্যক্ষ বৃদ্ধ টনি, আমাদের প্রিয় বিচারপতি তন্ত্র-রত্নাকর উড্রোফ প্রভৃতি কত লেখক যে আমার পুস্তকের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা

আমার এখন সমস্ত মনে নাই। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর প্রসিদ্ধ লেখক এফ, এস ক্লাইন মহোদয় লিখিয়াছিলেন "আপনার পুস্তক একটি মনুমেণ্ট, আমি অতিশয় আনন্দ সহকারে এই পুস্তক পড়িতেছি, আমি যে সকল তত্ত্ব জানিতাম না, তাহা ইহা হইতে শিখিতেছি।" *

য়ুরোপের সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী রথেনষ্টাইন আমার পুস্তক পড়িয়া অযাচিত ভাবে আমাকে সুদীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখিয়া আপ্যায়িত করেন, তিনি আমার সমস্ত বই গুলিই ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং উচ্ছ্বাসিত কবিত্বময় ভাষায় লিখিয়াছিলেম "আপনার পুস্তক একখানি যাদু কার্পেটের ন্যায়, ইহাতে চড়িয়া আমি যেন আপনার প্রিয় দেশটি আবার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। আপনার বই পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল যেন আমি মন্দিরের আরতি ঘণ্টা শুনিতে পাইতেছি, গঙ্গার ঘাটে নৌকারূঢ়া রমণীগণের কলধ্বনি যেন আবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। যদিও আপনি ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন, কিন্তু ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়া আপনার হিন্দু হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি এমনই আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে আপনার লেখার গুণে আপনার দেশ আমার চোখের সামনে যেন একখানি জীবন্ত চিত্রের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছে।'

সার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন আমার প্রত্যেকখানি পুস্তকের শুধু অশেষ গুণানুবাদ সম্বলিত পত্র আমাকে লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তজ্জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

---

* "Monumental work, I have been revelling in the book which taught me much of which I was ignorant"

শ্রীযুক্ত সিল্‌ভান লিভি মহাশয় এখন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের শীর্ষস্থানীয়, তিনি আমার পুস্তকগুলির যে গুণানুবাদ করেন, তাহা যে কোন গ্রন্থকারের পক্ষে শ্লাঘা ও গৌরবের সামগ্রী হইতে পারিত। তিনি ইংরেজীতে লিখিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসখানি পাইয়াই যে পত্রখানি লিখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। *

"আপনার পুস্তকখানি এই সপ্তাহ হ'তে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি, আরম্ভ করিয়া ছাড়িতে পারিতেছি না। কোন প্রশংসাই ইহার পক্ষে অত্যুক্তি হইবে না। ইহা চিন্তামণি—এবং রত্নাকর তুল্য, ইহাতে জীবন ও বিজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তকই আপনার পুস্তকের সঙ্গে তুলনা হয় না। বইখানি পড়িতে পড়িতে

---

* "I have begun this very week, and I cannot leave it off, I cannot give you praises enough. Your work is a Chintamani, a Ratnakar, full of science and of life. No book about India would I compare with yours. It seems as if I were wandering through your beautiful country and through the heart of your people. Never did I find such a realistic sense of literature; literary works with you are no dead writing, but living beings, where the spirit of generations breathes freely, widely, embodied for a time in their author, expanded afterwards in the multitude of readers and hearers. Pundit and peasant, Yogi and Raja mix together in a Shakespearian way —should I say too "a-la Sudraka" on the stage you have built up. I am eager to send you my sympathy, nay to express you my admiration.

মনে হইল—আমি আপনাদের সুন্দর দেশের ভিতর দিয়া, আপনার দেশীয় লোকদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌছিতেছি। আপনার পুস্তকের মত কোন পুস্তকেই এমন জীবন্ত সাংসারিক ও সাহিত্যিক চিত্র আমি পাই নাই। আপনার দেশের সাহিত্যে আপনার নিকট মৃত নহে,—ইহা যেন জীবন্তভাবে পরিপূর্ণ। বহুযুগের ভাব ও আদর্শ ক্ষণ-কালের জন্য গ্রন্থকার বিশেষে অভিব্যক্ত হইয়া পরিশেষে পাঠক ও শ্রোতৃ-বর্গের মধ্যে কিরূপে ছড়াইয়া পড়ে—আপনার পুস্তক তাহারই আলেখ্য। পণ্ডিত এবং কৃষক, যোগী এবং রাজা আপনার সৃষ্ট রঙ্গমঞ্চে সেক্ষপীয়র-সৃষ্ট জগতের মত মিলিত হইয়াছেন। আমি আপনাকে আমার আন্তরিক প্রীতি, শুধু তাহা নহে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস জানাইতে—ব্যস্ত হইয়াছি।"

---

(2) One can not praise too highly the work of Mr. Sen. A profound and original erudition has been associated with vivid imagination……The historian, though relying on his documents, has the temperament of an Epic poet. He has likewise inherited the lyrical genius of his race. His enthusiastic sympathy vibrtes through all his pages ……… The appreciation of life, so rare in our book-knowledge, runs throughout the work. One reads these, thousand pages with a sustaned interest ; one loses sight of the enormous labour which it presupposes ; one easily steps into the treasure of information which it presents. (Translated from French for the Bengali, April 18, 1912)

১৯১৩ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে সিল্‌ভন লেভি পুস্তক খানির একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

—"মিষ্টার সেনের পক্ষে কোন প্রশংসাই অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার মৌলিক এবং গভীর পণ্ডিত্য সুস্পষ্ট কল্পনা শক্তির সহযোগী হইয়াছে। যদি ও তিনি তাঁহার প্রস্তুত উপকরণ রাশি লইয়া ঐতিনিকের পন্থাবলম্বী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তটি মহাকাব্য লেখকদের মত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব গীতি-কবির প্রতিভাও তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছেন। তাঁহার উচ্ছ্বসিত সহৃদয়তা পুস্তকের সর্ব্বত্র ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের আধুনিক পুস্তক-গুলিতে মানবজীবনের প্রীতি মূলক জ্ঞান, অত্যন্ত বিরল,কিন্তু এই পুস্তক খানি আদ্যন্ত সেই সহৃদয়তায় অনুপ্রাণিত। পাঠক এই এক সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপক পুস্তক খানি আগাগোড়া কৌতুহলের সহিত পড়িবেন। যে বিরাট পরিশ্রমের ফলে পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে— রচনার সরসতা গুণে পাঠকের চক্ষে তাহা এড়াইয়া যাইবে—বহুতত্ত্বের যে ভাণ্ডার গ্রন্থকার-মুক্ত করিয়াছেন, তাহার ভিতরে পাঠক অনায়াস লব্ধ-প্রবেশ পাইবেন।"

আমার প্রতিবৎসরই ২৫০ হইতে ৩০০ পৃষ্ঠার একখানি ইংরেজী বই—মৌলিক সন্ধান করিয়া লিখিতে হয়, রামতনুলাহিড়ী ফেলোসিপের এই সর্ত্ত। এই ভাবে ৭ খানি বই লেখা হইয়াছে। তার মধ্যে চার খানি ছাপা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশিত পুস্তকের প্রত্যেক খানিই বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ সুচক্ষে দেখিয়াছেন। এই সূত্রে অনেক বড় লেখকের সঙ্গে আমার সর্ব্বদা পত্রব্যবহার-জনিত ঘনিষ্টতা হইয়াছে। বিলাতের বড় বড় গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের গ্রন্থে আমার পুস্তক হইতে মতামত উদ্ধৃত করিয়া এই সামান্য লেখকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। হ্যাভেলের শিল্পকলা সম্বন্ধীয় নানা পুস্তকে,Every man's

Library Series এর সম্পাদক Earnest Rhys কৃত গ্রন্থাবলীতে, ভিন্সেণ্ট স্মিথের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে,ম্যাকনিকোলের ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তকে, আওারউড, ফারকুহার, কুমার স্বামী এবং অপরাপর বিবিধ গ্রন্থকারগণের পুস্তক ও প্রবন্ধে আমার ইংরেজী পুস্তক হইতে নানা অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমার পুস্তকগুলির য়ুরোপীয় সমালোচনা এত অধিক হইয়াছে, যে তাহা হইতে অংশ বিশেষ উঠাইয়া দেখাইতে হইলেও একখানি বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। বাং ১৩১৯ সনের ১৯এ তারিখে আমেরিকা 508 W. High Street urbana Illinois. হইতে কবিবর রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমার মনে হয় ইংলণ্ডে আপনার লেখা ছাপিবার চেষ্টা করা উচিত,কারণ, সেখানে আপনার ইংরেজী গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য্য এবং ছাপার ভুল অপর্য্যাপ্ত। যাহা হউক, সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে, তখন এ দেশের দিকে না তাকাইয়া সেই দিকেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইবে।"

১৯১২ সনে বড় লাট হার্ডিং সাহেব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকসনে আমার পুস্তকগুলির বিশেষ সুখ্যাতি করেন এবং ১৯১৬ সনের নবেম্বর মাসে রমেশভবনের ভিত্তি স্থাপনোপলক্ষে লর্ড কারমাইকেল ও আমাকে প্রকাশ্য ভাবে প্রশংসা করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বিলাতে এবং দেশে এই পুস্তকগুলি লেখার ফলে আমি অনেক সম্মানিত বন্ধু লাভ করিয়াছি ; সার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন, পারজিটার, রদেনষ্টাইন, হ্যাভেল, জুলেব্লক, বেভারেজ, টাইমস পত্রিকার সহ-সম্পাদক ব্রাউন প্রভৃতি বহু সহৃদয় ইউরোপীয় পণ্ডিত এখন আমার মাননীয় বন্ধুর. মধ্যে গণ্য। বঙ্গীয় লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী

গুর্‌লে সাহেব আমার "Folk Literature of Bengal" পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন এবং বঙ্গদেশ এবং বঙ্গ সাহিত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক নানা সমস্যা লইয়া আমি অনেক বৎসর যাবৎ ঢাকা-বিশ্ব বিদ্যালয়ের ষ্ট্যাপলটন সাহেবের সঙ্গে বহু সংখ্যক সুদীর্ঘ পত্রে নানা রূপ তর্ক বিতর্ক চালাইয়া আসিয়াছি।

পুস্তকের এই অধ্যায়টা অযথা বড় হইয়া গেল। কিন্তু পাঠক সম্প্রদায় মনে রাখিবেন, এই প্রশংসোক্তি লইয়া যদি আমি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার কামনা করিয়া থাকি, তবে আমার মত কৃপাপাত্র আর নাই।

আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই, যদি ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া নিঃস্বার্থভাবে হিতকামী হইয়া কার্য্যকরা যায়, তাহা কখনই বিফল হয় না। আমি পূর্ব্বের অধ্যায় গুলিতে লিখিয়াছি—এই বঙ্গভাষার সেবাব্রত যখন গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমার মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল না, চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয় ও সুহৃদ্-বর্গ আমারই হিত ইচ্ছা করিয়া হাত বাড়াইয়াছিলেন—আমাকে এই পথে অগ্রসর হইতে বারণ করিতে। আমি তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত কোমল বাঁধার প্রতিকূলতা করিয়া দৃঢ়ভাবে আমার লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াছিলাম। রবিবাবুর প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি, তাঁহার ন্যায় কবিগণ ভগবানের আশীষ-মাল্য পরিয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছেন—ইঁহাদের কবিতা দেবীভারতীর নৃত্য-কলা; যাহা লিখিয়াছেন তাহাই পৃথিবী কান পাতিয়া শুনিতেছে। গীতাঞ্জলীর মত ক্ষুদ্র একখানি পুস্তক সাহিত্য-জগতকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি তো এই সকল ভাগ্যধরের মত প্রতিভার শ্রী কপালে পরিয়া আসি নাই—আমি এমন দুর্লভ আনন্দদানের শক্তি পাই নাই।

আমার যাহা ছিল ও আছে, তাহা সকলেই পাইতে পারেন,—কোন লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহার পশ্চাৎ মুখ-রজ্জু বিমুক্ত অশ্বের ন্যায় দিক্ বিদিক বিবেচনা না করিয়া ছুটিয়া যাওয়া—কোদাল-হস্ত পুষ্করণী-খনন-শীল রৌদ্র- বৃষ্টি-হিম অগ্রাহ্যকারী কুলির মত খাটিয়া যাওয়া। সে খাটুনি যে আমি খাটিয়াছি, তাহা কেহ সন্দেহ করিবেন না। আমার লিখিত শুধু ইংরেজী পুস্তকগুলি দেখিয়া একজন সিনেটের ফেলো প্রকাশ্য ভাবে সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'দীনেশবাবুর প্রকাশিত রচনার আয়তন দেখিলে ভয় হয়।' স্বয়ং স্যার আশুতোষ এক সভায় বলিয়াছিলেন, 'দীনেশবাবুর অপর্য্যাপ্ত লেখায় আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের মুদ্রাযন্ত্রালয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বহু খাটুনির ফল আমার লেখা। বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি মজুর ও কুলির খাটুনি খাটিতেছি। এই পরিশ্রমের ফল ভগবান আমাকে কিছু দিয়াছেন, সুতরাং আমি কর্ম্ম-ফল-সম্বন্ধে একটুকুও সন্দিহান হই নাই। এই নির্ভর ও পরিশ্রমের পরিণাম সম্বন্ধে যদি আমার এই লেখা একটী মাত্র তরুণ যুবককেও কর্ম্মে উদ্বোধিত করিতে পারে, লক্ষ্য অনুসরণ করিবার পথে দৃঢ় সংকল্পারূঢ় করিতে পারে, তবে এই যে প্রশংসোক্তির কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহা সার্থক হইবে, নিজ হাতে নিজ জয়ডঙ্কা বাজাইবার অপরাধের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পাইব।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া যদি আমি এই ভাষায় বিন্দুমাত্র ও উপকার করিয়া থাকি,—তবে আমার সমস্ত প্রাণান্ত খাটুনির যা কিছু পুরস্কার পাইয়াছি, তাহা খোয়াইতে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করিব না। "বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের" যশ অটুট থাকুক, আমি ভগবানের নিকট এ প্রার্থনা করি না। আজ যাহারা বাঙ্গলায় এম, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন ও করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন নূতন তত্ত্ব

আবিষ্কার করিয়া আমার পুস্তকগুলিকে হীনশ্রী করিয়া ফেলেন, তা হ'লে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে। যদি আমার সামান্য পুস্তকগুলি সেই সেই বিষয়ে দীর্ঘকাল আদর্শ পুস্তক হইয়া থাকে—তাহা অপেক্ষা বঙ্গ সাহিত্য-সেবীর অপবাদ আর কি হইতে পারে? ভাবী লেখকগণের চেষ্টায় যেন আমাদের অতি আদরের ভাষার ইতিহাস শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং আমার সামান্য গ্রন্থাবলী নিষ্প্রভ করিয়া ফেলে। তা হইলে যে মজুর প্রথম উদ্যমের ইট সুরকি জোগাইয়াছে—তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিবে না। সে শুভ দিন কি আমি দেখিয়া যাইতে পারিব?

———

অপরাপর বন্ধু ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ।

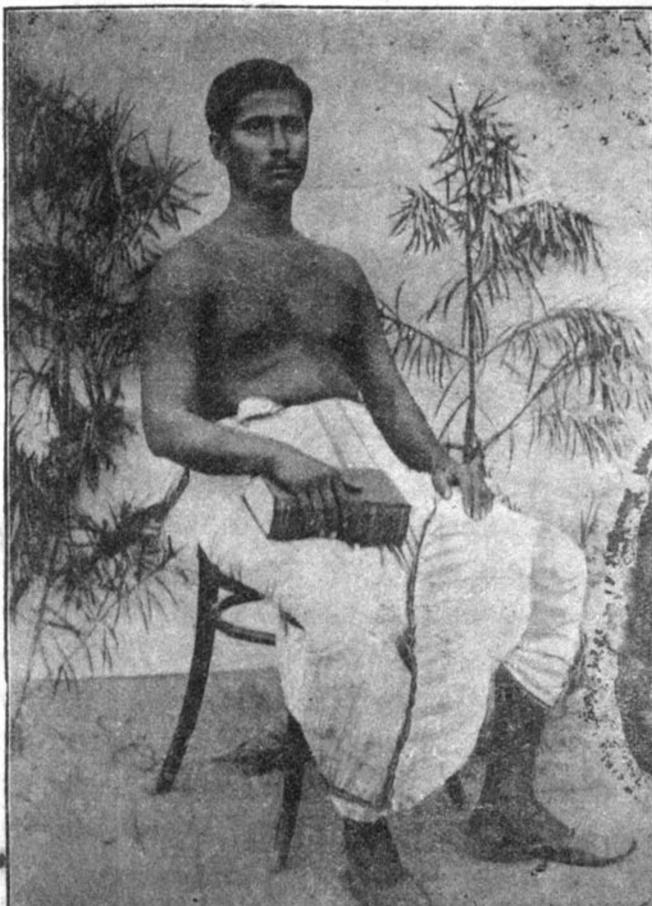
বহুবৎসর হইল, একদিন সাহিত্য-পরিষদের সভায় বসিয়া আছি—তখন এই সভা শ্যামপুকুরের ষ্ট্রীটের মুখে ডাইন দিকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর বসিত। এমন সময় ফড়িংএর মত শীর্ণ দেহ—অতি সামান্য সার্ট গায়ে, একটী ভদ্রলোক আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; মুখে খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট দাড়ি, বোধ হয় খেউরি হইবার অবকাশ হয় নাই, কিন্তু আমার মনে হইল পয়সা জুটে নাই,—ইহাঁর সঙ্গে আমি অনেকটা আমার নিজ অহঙ্কার বজায় রাখিয়া কথা বলিতে লাগিলাম, অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে, কারণ ইহাঁকে আমি কোন নগণ্য ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম। এই সময় টাকির জমিদার প্রসিদ্ধ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ল্যাণ্ডো হইতে অবতরণ করিলেন—ইনি দ্বিপ্রহরের সময়ও ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গাড়ীর দরজা অাঁটীয়া বন্ধ করিয়া চলা ফেরা করেন,—যতীন্দ্র বাবুর দেহটী বেশ একটু স্থূল,—কিন্তু মূর্ত্তি অতি সুদর্শন, বন্ধুবান্ধবের আনন্দ-দীপ,চোখে সোনার চসমা মুখের গৌরবর্ণকে যেন আর একটু মনোরম করিয়াছে, ভুঁড়িটি একটু দোলাইয়া তিনি গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক, আমার পার্শ্ববর্ত্তী সেই অতি দীন বেশী লোকটিকে দেখিয়া গর্ব্ব-প্রীতি ফুল্ল নেত্রে অভিবাদন

করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া সভাপতির আসনের নিকটবর্ত্তী একটা ভাল জায়গায়,—ভদ্র লোকটীর নানাভাবে এড়াইবার চেষ্টা সত্ত্বেও,—যেন একটু জোর করিয়াই বসাইলেন। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে?" শুনিলাম, ইনিই প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অধুনা 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত। রসায়ণ বিদ্যা ইহাকে আশ্রয় করিয়া জগতে আরও কতকটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এই জগন্মান্য ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম তাহার অনাড়ম্বর এমন কি দীন বেশ সত্ত্বেও চক্ষু দুটি হইতে যেন প্রতিভা জ্বলিতেছে। রসায়ণ বিদ্যা লইয়াই তো ইঁহার জগতে গৌরব, কিন্তু তিনি ইতিহাস এবং সাহিত্যের ও অনুরাগী, তাহা শেষে জানিতে পারিলাম। হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে ইঁহার মহাপ্রাণ একান্ত অধীর ভাবে ব্যথিত, দুর্ব্বাসার মত ভ্রূকুটী-কুটিল মুখে ইনি সমাজিক প্রতারকদিগকে কখনও কখনও গালিমন্দ দিয়া থাকেন—তাহা যে কত ব্যথা ও কত মমতার পরিচায়ক তাহা গোড়ামিতে অন্ধ হইয়া অনেকে বুঝিতে পারেন না। ইঁহার দান-শীলতা—গল্পের ন্যায়, সমস্ত আয়ই প্রায় বিলাইয়া দেন। জাতীয় চেষ্টায়—ধনাগমের পথ ইনিই বাঙ্গালীকে প্রথম বুঝাইয়াছেন। রসায়ণ শাস্ত্র-চর্চ্চার তুঙ্গ শৃঙ্গে বসিয়া ইনি ধ্যানী বুদ্ধের মত থাকেন নাই—ইনি ব্যবসায়ের দ্বারা জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিকল্পে যে প্রেরণা দিতেছেন—তাহাতে ইহাঁকেই আমরা বর্ত্তমানে কালের উপযোগী একজন আদর্শ জননায়ক বলিয়া বরণ করিতে পারি। ইনি আমার ইংরেজী 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বইখানি এমন ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, বোধ হয় খুব অল্প বাঙ্গালীই সেরূপ ধৈর্য্য সহকারে বইখানির আলোচনা করার সুবিধা পাইয়াছেন। একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের কক্ষে বসিয়া উক্ত সাহেবের নিকট আমার পুস্তক হইতে এত কথা মুখে

মুখে উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন যে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে তাঁহার ছাত্র-সুলভ অধ্যয়নের স্বভাবটি এখনও বজায় আছে।

এই সময়ে আর একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল, এখনও তাঁহার কথা মনে পড়িলে চক্ষে জল আসে। হায় কবি রজনী সেন! আমার কাঁটাপুকুরের বাড়ীতে এমন অতিথি আর পাইব না। কত রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত যে ইনি কোকিল-কণ্ঠে গান করিয়া মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিয়াছেন! যিনি যেখানে বসিতেন, তিনি সেই খানেই ছবির মতন বসিয়া থাকিতেন—তাঁর কথা কত বলিব! তাঁহার গান গুলি তো এখনও আছে, পাড়াগাঁয়ে কোকিলের ডাক পাপিয়ার গান যেমন অহরহ শুনা যায়,—রজনী সেনের গান শোনা ও তেমনই সুলভ, কিন্তু যে ভক্তিতে "হে বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা, তব শ্রীচরণতলে নিয়ে যাও মোর মত্ত বসনা গুছায়ে" তিনি উন্মত্তের মত, সুরলহরীর ঐন্দ্রজালিক মোহ সৃষ্টি করিয়া গাইতেন, সে ভক্তি আর কোথায় পাইব? আমার বাড়ীতে একটা হারমোনিয়াম, এখনও আছে, যাহা রজনী সেনের হাতে পড়িয়া তাঁহার স্পর্শ সুখে অধীর ভাবে ভগবানকে যেন ডাকিয়া কথা শুনাইত,—"ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি, এক পা ও ফিরে যাও নি" প্রভৃতি গানের কবিমুখোচ্চারিত সুরটি এখনও যেন স্বপ্নোত্থিতের মত শুনিতে পাই। রজনী তর্ক-যুদ্ধ ভাল বাসিতেন না, গাহিয়া গাহিয়া কণ্ঠ রোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যখন সেই কণ্ঠ ডাক্তারগণ নিষ্ঠুর ভাবে কাটিয়া দিলেন, তখন কোকিলের কাকলী একেবারে বন্ধ হইয়া গেল—ছিন্ন কণ্ঠ কোকিলকে কলিকাতায় হাসপাতালে দেখিয়া যে কষ্ট বোধ করিয়াছি—তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। প্রাণটা ছিল তাঁর শিশুর মত কোমল। একদিন এক ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়া বাহাদুরী

410



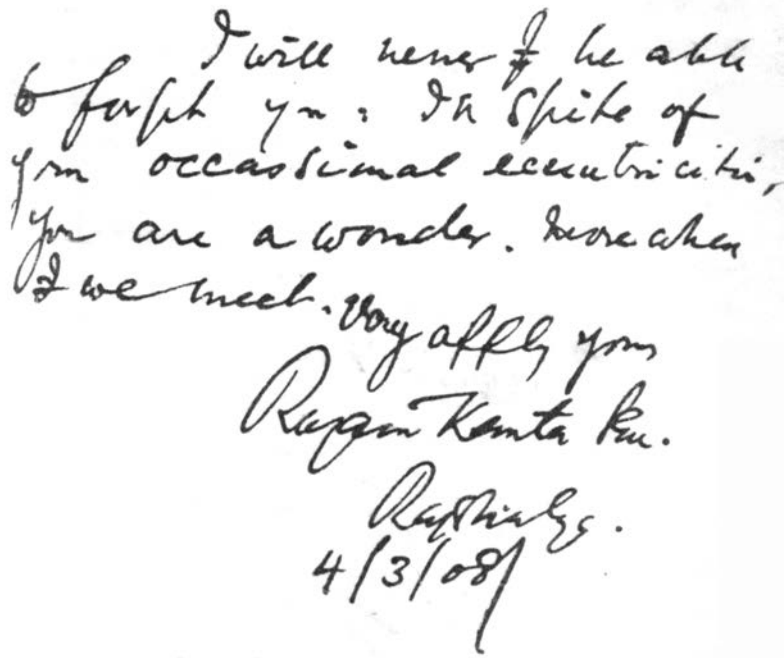
কান্তকবি রজনীকান্ত।

লইতেছিলেন ; সতী যেরূপ শিবনিন্দা শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন—সেই দিন রজনীর মুখে সেইরূপ নির্ম্মম আঘাত পাওয়ার ভাব দেখিয়াছিলাম। সেই তর্ক-শাস্ত্রের বাহাদুর রজনীর মুখের ভাব দেখিয়াই তর্ক চালাইবার সাহস পাইলেন না কোন অকথিত ত্রাস ও লজ্জার ভাবে চুপ করিয়া গেলেন। রজনীবাবুর গান শুনিবার জন্য একদা মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর আমাকে চিঠি লিখিয়া সময় ঠিক করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে দিন সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত মাহারাজ-প্রাসাদে আমরা তাঁহার গান শুনিয়াছিলাম। মহারাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারাদি করিতেন, কখনই প্রায় ব্যতিক্রমে হইত না। কিন্তু সে দিন সময় অতিক্রম হইয়া গিয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে রজনী একদিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর বসিয়া গিয়াছে ; কথা চাপা, যেন গলায় বাহির হইতেছিল না, বুঝিলাম গলায় ক্যান্সার হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "গুরুদাস লাইব্রেরী আমার বাণীও কল্যাণীর কাপি রাইট ৪০০৲ টাকা মূল্যে কিনিবেন, কিন্তু আমাকে তাঁরা চেনেন না, আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, তবে টাকাটা এখনই পাইতে পারি।" আমি বলিলাম "আমার জর হইয়াছে, উঠিবার সাধ্য নাই। হরিদাসবাবুকে চিঠি দিতেছি, আমার হাতের লেখা তাঁরা চেনেন, চিঠি পাইলেই টাকা দেবেন।" শুনিলাম চিঠি লইয়া গিয়া তিনি টাকা পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম-সমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ ছিল। এপর্য্যন্ত তাঁহার মত, উদার, মনস্বী ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি আমি দেখি নাই, বলিলেই চলে। তিনি বাগ্মী ও সুলেখক ছিলেন, এ সকল তো তাঁর জীবনের চাল-চিত্র মাত্র,কিন্তু তাঁহার জীবন ও চরিত্র ছিল —একটা বড় আদর্শ। সমাজের গোড়া হইয়া অন্ধ কুসংস্কারাপন্ন বুড় বাপ

মায়ের কথা বলিতে যাইয়া কোন্ ব্রাহ্ম শাস্ত্রীমহাশয়ের মত এরূপ ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন! তাঁহাদিগকে যে তিনি ত্যাগ করিয়া কষ্ট দিয়াছেন, সে কথা শেলের মত তাঁর হৃদয়ে বিঁধিয়াছিল, তাঁহার মাতা যে তাঁর শৈশবে পীড়া হওয়ার দরুন ঠাকুর দেবতার কাছে ধন্না দিয়া বুকের উপরে গরম ধুনচি রাখিয়া ফোস্কা তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন—সেই কুসংস্কারের চরম কাহিনী বলিতে যাইয়া আর কোন্ ব্রাহ্ম অশ্রুসিক্ত হইতে পারিতেন!—সমাজের গণ্ডীর বাইরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা তিনি যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত বলিতেন,—জুয়োলজিকাল গার্ডেনে সিংহ দেখিতে পাইবেন—মায়ের বাহন'সিংহ দেখিবেন শিশুর মতন পরমহংসদেব সেই কথা বলিতে বলিতে 'মা মা' বলিয়া সমাধি প্রাপ্ত হইলেন—এরূপ শ্রদ্ধার সহিত কোন ব্রাহ্ম এই সকল কুসংস্কারের পায় অর্ঘ্য দিতে প্রস্তুত হইতেন? ব্রাহ্মমন্দিরে মেয়ে লোকের বাহুল্য দেখিয়া পরমহংসদেব শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—"তোরা এসকল কি করিয়াছিস্, চারাগাছ পুতেই ছাগল লাগিয়েছিস্, ধর্ম্মটা যে একবারে সাবাড় হয়ে যাবে!" এই কথা বলিতে বলিতে শাস্ত্রী মহাশয় হাসিয়া খুন হইতেন,—কোন্ ব্রাহ্মের এ কথা বলিতে গিয়া মুখ রাগে রাঙ্গিয়া না উঠিবে? এইটি ছিল তাঁর বিশেষত্ব! তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য সব ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু উদারতাটি ছাড়েন নাই, অন্যান্য সমাজের যাহা ভাল তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাটি ছাড়েন নাই। যিনি পিতা-মাতা স্ত্রী—সকলের প্রতিকূলে ধর্ম্মত্যাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে যে এই উদারতা রক্ষা করা কত বড় মহত্বের পরিচায়ক তাহা আর কি বলিব? তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশের পর আমার সম্বন্ধে যে উচ্চ গুণানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, আমি রোগের শয্যায় পড়িয়া সেই মন্তব্য পাঠে মনে মনে তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে সহযোগে বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রশ্ন


I will never be able to forget you. In spite of your occasional eccentricities, you are a wonder. More when we meet.

Very affly yours
Rajani Kanta Sen.
Rajshahy.
4/3/08

গ্রন্থকারের নিকট কবি রজনীকান্তের লিখিত চিঠির অংশ।

করিতে নিযুক্ত ছিলাম। যাঁহারা বৃদ্ধ সহযোগী হইতেন, তাঁহাদের কাজটা আমিই করিয়া দিতাম এবং একটা স্বাক্ষর লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু আমি সেইরূপ সমস্ত কাজ করিবার ভার নিজে লইতে ইচ্ছুক হইলেও তিনি রুগ্ন অবস্থায়ও কখনও তাহাতে সম্মত হইতেন না, তাঁহার অংশ তিনি তৈরী করিয়া দিতেন। যে বৎসর হইতে তিনি উহা পরিবেন না, বুঝিলেন, সেইবার পদত্যাগ করিলেন। এই সততা সংসারে দুর্ল্লভ! একদিন আমি বলিলাম, "নমঃ শূদ্রেরা পাছে ছেলে মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে—এই আশঙ্কায়, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে সাহসী হইতেছেন না, পাদ্রীরা তাঁহাদের মধ্যে অনেককে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছেন।" তিনি শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—"যে সকল দরজা খুলিয়া দিব বলিয়া হিন্দুসমাজের রুদ্ধ গৃহ ত্যাগ করিলাম, ইহাঁরা সেই সকল দরজা আটকাইতেছেন।" তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়া মনে করি নাই, পুকুরে থাকিয়া যেরূপ পদ্ম-কুসুম সর্ব্বদা উর্দ্ধ আলোকের দিকে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে অবলম্বন করিয়া সেই ভগবানের দিকে চাহিয়াছিলেন, যিনি কোন এক সমাজের আরাধ্য নহেন, সর্ব্ব সমাজের একমাত্র নমস্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা ম্যাট্রিকুলেসেনে বাঙ্গলার পরীক্ষক ছিলেন—সেই সূত্রে আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইতে হইত, যখনই যাইতাম, তখনই শাস্ত্রী মহাশয়ে কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া আসিতাম।

এই পুস্তক অতিরিক্ত বড় হইয়া চলিল। আরো বহুলোকের কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু জায়গায় কুলাইতেছে না। সুকবি অক্ষয় বড়াল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এ জগতে কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না।

সুরেশ সমাজপতি মহাশয় আমার কাছে নিজের একটা দুর্ভাগ্যের কথা বলিতেন, তাঁহার সকল সাহিত্যিক বন্ধুই প্রথম প্রথম তাঁর খুব পক্ষপাতী থাকিতেন—কিন্তু শেষে সেই বন্ধুত্বটি রক্ষা করিতে পারিতেন না। এরূপ হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন "আমার স্পষ্টবাদিতা, "সাহিত্যের" নিরপেক্ষ সমালোচনা, কাহারও মন যোগাইবার মত করিয়া আমি কথা কহিতে জানি না।" এই 'সস্পষ্টবাদী' ব্যক্তির যে স্বল্পসংখ্যক স্থায়ী বন্ধু ছিলেন, তন্মধ্যে বড়াল কবি একজন। কি ভাবে তাঁহার হৃদয় মৃত্যুকে জয় করিয়া জীবনের পরপার পর্য্যন্ত এক নিষ্ঠতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহা তাঁহার বহুসংখ্যক কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, সে গুলি তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে লেখা। বড়াল কবি জীবন-মরণের সঙ্গী,যাঁহারা এই গৌরমূর্ত্তি ভট্টাচার্য্যের মত উদার ঔদার্য্যপূর্ণ হাস্য-মুখ বন্ধুকে জানিতেন, তাঁহারা আমার কথা গুলি নিশ্চয়ই সমর্থন করিবেন। কবি দেবেন্দ্র ছিলেন, কবিতার রাজা, অন্য কবিদের দুদশটা কবিতা বাদ দিলে আসে যায় না, বড় বড় কবির ও সব রচনা ভাল উৎরায় না—সমস্ত কবিতাতেই কিছু প্রতিভার ছাপ থাকে না, নামের জোরে দশটা ভাল সামিগ্রীর সঙ্গে দুটো খারাপ মালও বিকাইয়া যায়। নেংড়া আমের ঝুড়িতে পাইকার দুইচারটা মুর্শিদাবাদী বানরমুখো কালো আমও চালাইয়া দেয়। কিন্তু দেবেন্দ্র কবির প্রতিটি কবিতা প্রতিটি ছত্র হইতে অসামান্য শক্তির চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার যে কোন কবিতা পড়িলেই মনে হইবে ইহা প্রকৃত কবির লেখা,—তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্য বোধ, হৃদয়ের ভাব প্রবণতা, পল্লীলক্ষ্মীর অলক্তরঞ্জিত পদাঙ্ক দেবী-ভারতীর আঙ্গিনায় যেন ঝলমল করিতেছে। এইসকল গুণ—তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার ছাপ—প্রত্যেকটি ছত্রে বিরাজ করিতেছে, তাহা ভুল করিবার যো নাই। দুর্ভাগবশতঃ তাঁহার কথাবার্ত্তায় এই কবিত্ব কিছুই ধরা পড়িত না। কথা-

গুলি ছিল এলোমেলো রকমের,—একটা ঔদাসিন্য, সংসার ও বিষয় বুদ্ধির ত্রুটি কোথাও কোথাও ধরা পড়িয়া যাইত। কবি কবিতার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতেন, বাহিরে যেন ধরা দিতেন না। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় বেশী ঘনিষ্ঠ ছিল না, আমি তাঁহাকে অল্প সময়ের জন্য পাইয়াছিলাম—এই জন্য বোধ হয় সামান্য পরিচয়ে তিনি নিজকে আমার নিকট পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে সংকোচ বোধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সভায় বসিয়া তাহার হাসির গান সুরু করিয়া দিলে সমস্ত দিকের কল-কোলাহল চুপ হইয়া যাইত। দেহ ছিল তাঁর কতকটা স্থূল, মাথায় বেশ বড় রকমের টাক—গৌরবর্ণ মুখ-চোখ আনন্দময়,—আদবেই বহুভাষী নন, বরং বহু জনতা দেখিলে চুপটি করিয়া এক কোণে বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু তাহার প্রতিভার এই সলজ্জ ভাবটা অন্তরঙ্গের কাছে একবারে ভাঙ্গিয়া যাইত। যখন তিনি নিজের হাসির গান গাইতেন, তখন তাঁহার রচিত প্রত্যেকটি শব্দ যেন মুর্ত্তিমান হইয়া আসরে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া দিত। সন্তোষের প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রায়ই সন্ধ্যার পর আমাদের মিলন হইত, তখন তিনি গান গাওয়ার সময় হাত ও মুখের এ রকম কায়দা করিতেন, যেন হঠাৎ গানের সুরটা কথাবার্ত্তার সুরে পরিণত হইয়া যাইত। সংগীতের এই গদ্যে অনুবাদ এত দ্রুত হইত, যে তাহাতেই হাস্য-রসটা খুব বেশী জমিয়া যাইত। ধরুন, বুড় বুড়ির গানে "বুড় বুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত" হইতে "পাড়ার লোকে পুলিস ডাকৃত"পর্য্যন্ত বেশ হাস্যরসো-দ্দীপক কাতর কণ্ঠে বুড় বুড়ীর দাম্পত্যের এই বিরোধের দিকটা গাহিয়া যাইতেন, এই ঝগড়াটার দুঃখে যেন কবি অতিশয় ব্যথিত, তাঁহার কণ্ঠ স্বরের সেই করুণার ভাব জাগাইয়া—চোখে-মুখে বিষণ্ণতা প্রকট করিয়া যখন তিনি গাইতেন— তখন তো আমরা হাসির উচ্চ শব্দে তাঁহাকে

অভিনন্দিত করিয়া গান শুনিয়াছি। কিন্তু হঠাৎ যেন তিনি রাগিয়া গিয়া গান বন্ধ করিয়া ফেলিলেন, "একদিন" পর্য্যন্তও কণ্ঠস্বরটা গানের মতই থাকিল তার পর "ধত্তর" কথাটা আর গান নয়, সত্য—সত্যই যেন কবি রাগিয়া গিয়া চোটের সহিত "ধত্তর" কথাটা বলিয়া গানটা থামাইয়া দিলেন তারপর "ব'লে। বুড় কোথায় গেল চলে।" আবার গানের সুরে আরব্ধ হইল। মধ্যের"ধত্তর" শব্দটা বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক নিছক গদ্য; ঐ কথাটা ক্রোধের ভাবে উচ্চারণ করিবার সময় তাঁর ভুরু ছুটি সত্য সত্যই কুঞ্চিত হইত এবং মুখখানি বিরক্তি ও কুটিলতার ভাব ধারণ করিত। তাঁহার অপেক্ষা ঢের মিষ্ট স্বরে এই সকল গান অপর গায়কেরা গাহিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার মত এই সকল গানে কমা, সেমিকলন দিয়া গাহিয়া কেহই সেরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না,—রঙ্গরসের দেবীকে শ্রোতৃবর্গের সাক্ষাতে তেমন করিয়া আনায়ন করিতে পারেন না। একদিন তাঁহার বাড়ীতে তিনি আমার নিকট তাঁহার পুত্র দিলীপের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া "আমরা ইরান দেশের কাজী"এই গানটি গাহিয়াছিলেন,—দিলীপ ছিলেন তখন ৯।১০ বৎসর বয়স্ক, পিতা-পুত্রের গান যা শুনিয়াছিলাম, নৃত্য যা দেখিয়াছিলাম, আমার মনের মধ্যে তার একখানি ফটোগ্রাফ রহিয়া গিয়াছে, এতদিনেও মুছিয়া যায় নাই। আর একদিন নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা বিবাহের উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন রায়সাহেব হারাণ চন্দ্র রক্ষিত,—যেরূপ দুই একটা কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহাতে গতিক ভাল না বুঝিয়া রায়সাহেব-মহাশয়কে হাতে ধরিয়া আমার বাড়ীতে উঠাইয়া আনিলাম। দিলীপবাবু এখন বিলাতে গিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে এণ্ডার্স'ন সাহেব আমাকে অনেক প্রশংসার কথা লিখিয়াছিলেন, সে পত্রখানি আমার কাছে আছে।

আমার কাঁটাপুকুরের বাড়ীর প্রতিবেশী ছিলেন নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্র

ঘোষ। বোসপাড়া লেনে তিনি বসিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া থাকিতেন,যেন নগাধিরাজ। শেষ বয়সে পরমহংস দেবের কথা পাইলে তিনি আর কোন কথা বলিতেন না। তিনি কতবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, নাটক দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি সে অনুরোধ প্রতিপালন করিতে পারি নাই। রঙ্গ-মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি যেন নিজে একটু লজ্জিত থাকিতেন। একদিন তিনি আমাকে সত্য সত্যই বলিয়া ছিলেন, "দীনেশবাবু, আপনারা কি আমাকে ঘৃণা করেন?' আমি বলিয়াছিলাম, "সে কি কথা? আপনি নাট্য-রাজা, সাহিত্যের রাজা—এখন ভক্তির রাজা—আপনাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।" কিন্তু মনে মনে তিনি লজ্জিত থাকিতেন। সভা সমিতিতে যাইতে বড়ই কুণ্ঠিত হইতেন।

তাঁহার সহচর সহ-কর্মী ছিলেন অমৃত বসু—এখন তিনি বৃদ্ধ, দীর্ঘ চুলগুলির সব সাদা, মুখশ্রী একখানি শাণিত তরবারীর মত। বাঙ্গলা বক্তৃতায় যেন বৈদ্যুতিক আলো খেলে—তাঁহার প্রহসনগুলি বড় দুঃখের হাসি, সে হাসির উপাদান শুধু অশ্রু—সেই নাটকগুলি বিয়োগান্ত কাব্য অপেক্ষা ও করুণ—উহারা তীব্র কশাঘাতের ছলে অমৃত-প্রলেপ,—ডাক্তারের ছুরি, কাটিয়া ফেলায় সত্য, কিন্তু আরাম করিবার জন্য। কথাবার্ত্তা, বক্তৃতায় ইনি ধুরন্ধর, ভাষায় বাণীর মুখরতা ও কবিতার ছন্দ।

আমার বাড়ীর কাছে একজন শীর্ণকায় শ্যামাঙ্গ ব্যক্তি মাঝে মাঝে ঝড়ের মতন চলিয়া যাইতেন। আমি কখনও তাঁহার সঙ্গে দুই একটি মাত্র কথা বলিবার সুযোগ পাইয়াছি মাত্র। তিনি বঙ্গদেশের কাল-বৈশাখী, প্রচণ্ড ঝটিকা - বাবু শিশিরকুমার ঘোষ। ইনি যে ক্ষেত্রে যখন গিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে জন-সাধারনকে যেন উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন

—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইনি তুবড়ির আগুণ, কিন্তু যখন ভক্তি-ক্ষেত্রে নামিলেন, তখন সেই ঝটিকা অশ্রুজলে মিসিয়া সাইক্লোনের আকার ধারণ করিল। অমিয়-নিমাই চরিত, কালাচাঁদ গীতা, নরোত্তম জীবনী বন্যার মত বঙ্গীয় গৃহস্থকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। একজন লেখক বাইরণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "He came and went like a shooting star, dazzling and perplexing" শিশিরবাবুর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রবাবুর পরে সাহিত্যের সিংহাসন কাহার অধিকারে আসিবে—জানি না, কিন্তু শরৎচন্দ্র বোধ হয় পারিবেন না। তাঁহার প্রতিভার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম,তাহা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। সর্ব্ব প্রথমে আমরাই তাঁহাকে প্রকাশ্য ভাবে অভিনন্দন করিয়াছিলাম; তাঁহার "রামের সুমতি" ছোট হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার জোড়া নাই, তাহার "পণ্ডিত মশাই" "চন্দ্রনাথ", "বিন্দুর ছেলে","স্বামী" প্রভৃতি বহু পুস্তকে তিনি অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। পল্লী হইতে আসিয়া তিনি সহরে জয়ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন—আমরা ছোট বেলায় যে শুনিয়াছিলাম "বন হতে এল টিয়া। সোনার মুকুট মাথায় দিয়া।" সেই ভাবেই আমরা তাহাকে বরণ-ডালা লইয়া অভিনন্দন করিয়াছিলাম—তাঁহার চরিত্রটিও প্রথম মিলনের সময় সাহিত্য সমাজে একটা অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল। যশ-মানের দিকে একবারে লক্ষ্য ছিলনা, তাঁহার সম্বন্ধে খুব প্রশংসার সমালোচনা হইলেও তিনি একান্ত উদাসীনের মত থাকিতেন, তাহা পড়িয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার হইত না। একবার আমার বেহালার বাড়ীতে কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কোন এক রমনীর প্রতি চাবাগিচার লোকদের অত্যাচারের কথা বলিতে ছিলেন, হঠাৎ শরৎচন্দ্র বুক হাতে চাপিয়া সাশ্রু চক্ষে হাত

বাড়াইয়া বলিলেন "আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না"—তখন তাহার সুকোমল চিত্ত-বৃত্তির যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, ইনি হৃদয়বান্, এরূপ লোক সচরাচর দেখা যায় না! আর এক দিন শুনিলাম শরৎ বাবু তাঁহার একটা পোষা কুকুর হারাইয়া সারাদিন কলিকাতায় অলি-গলীতে 'হায় হায়' করিয়া বেড়াইতেছেন,তখনও বুঝিয়াছিলাম—ইনি ঠিক সাধারণ লোকের মত নহেন, যাহাকে লোকে "কবি" "দেওয়ানা" প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন, ইনি খাটী সেই জাতীয়।

কিন্তু সহরে রোগ তাঁকে পাইয়া বসিয়াছে। এমন যে শিউলীফুলের গাছ, যাহা অজস্র উপহার দিয়া শত শত ভক্তের সাজি ভর্ত্তি করিয়া দেয়, তাকেও যদি কেউ কালে অকালে "ফুল দাও, ফুল দাও" বলিয়া ধরে, তবে কি সে তাহার কোমল উপঢৌকন বেশী দিতে পারে? অসময়ে ফুলের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া লাঠি দিয়া আঘাত করিলেও সে পাতা ছাড়া কিছু দিতে পারে না। একগোষ্টি পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রকাশকের দল তাঁহাকে উপন্যাসের জন্য এমনই আকড়াইয়া ধরিয়াছেন—যে শরৎ বাবু অনন্যোপায় হইয়া মাসিকের মধ্যে অনেক আগাছা ও দুর্ব্বাঘাস ছাড়াইতেছেন। তাঁহার শেষ কয়েক খানি পুস্তকে রবিবাবুকে নকল করিতে যাইয়া তিনি একরূপ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; রবিবাবুর সেই অপূর্ব্ব কবিত্বের দীপ্তি তাহাতে নাই—কিন্তু আছে দুনীর্তির বীভৎসতা; এমন কি শ্রীকান্তের ভ্রমণের পূর্ব্বভাগ, যাহা বঙ্গভাষার এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তি স্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য—তাহার শেষ কয়েক ভাগ তিনি ফেণাইয়া এমন দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন, যে যাহা ক্ষীর হইয়া সুরু হইয়াছিল—তাহা প্রায় ঘোলে দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক আজকাল আর ইনি পরের মন্তব্যে তেমন উদাসীন নহেন, এজন্য অনেক সঙ্কুচিত হইয়া লিখিলাম।

—

(২৫)

বেহালায়

আমার মধ্যম পুত্র অরুণ এই সময় (১৯১৫) এম, এ পাশ করিয়া আমাকে চিঠি লিখিলেন, তিনি আমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহেন। ইহার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল এবং কিরণ পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া ৩০১ টাকা বেতনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি দেখিলাম যাঁহারা সংসারের ভার লইবেন, তাঁহাদের কেহ অনিচ্ছুক,কেহ অপারগ, সুতরাং কলিকাতার কাছে কোন একটা পল্লীতে বাড়ী করিয়া কাঁটাপুকুরের বাড়ীর ভাড়া পাইলে সংসার খরচটা আমার অভাবে ও কতক পরিমাণ চলিয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া বাড়ী করিবার জন্য নানা স্থান দেখিতে লাগিলাম। বেহালাই পছন্দ হইল; সেখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস, ট্র্যাম আছে, জলের কল আছে, হাই স্কুল, মহাকালী পাঠশালা, ছাত্রবৃত্তি স্কুল, এবং দুইটি বাজার আছে। যে যায়গাটা পছন্দ করিলাম, তা অনেকটা আমার সুয়াপুরের বাগান বাটিকার মত। চারিদিকে গাছের নিকুঞ্জ,—আম, জাম, কাঁটাল, নারিকেল, লিচু—সমস্ত ফলবান তরুর চারু সমাহার,—গুবাক-পংক্তিতে সজ্জিত;—একটি বাঁধা-ঘাট নির্ম্মল নীল-সলিলা বাপী; সেই সুন্দর স্থানটি দেখিয়া আমার দেশের বাড়ী মনে পড়িল। কিন্তু আমি সেই সময়েই উহা

কিনিলাম না। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই তিনটি মাস রোজ যাতায়াত করিয়া দেখিলাম, কাহারও জর হইল না;—ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকদের চেহারা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট দেখিলাম,—সুতরাং ম্যালেরিয়ার অপবাদ অনেকটা বাজে কথা বলিয়া বোধ হইল।

বহুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া পল্লীজীবনের আনন্দ নূতন বোধ হইল। কৃষ্ণদা, (কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) পথের লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। তিনি এতদূর আত্মীয়তা দেখাইলেন যে দুদিনের মধ্যে আমি তাঁহার ছোট বড় সকল ছেলে মেয়ের "কাকা বাবু" হইয়া পড়িলাম। আশুবাবুরা কয়েক ভাই আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন, এবং এতটা আত্মীয়তা দেখাইতে লাগিলেন যে আমি মুগ্ধ হইলাম। অক্ষয় বাবুর শুভ্রকেশ ও স্ফীতোদর,—যেন আমার কতকালের চেনা, দুদিনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব হইল এবং দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর মাতা ঠিক মায়ের মত এত স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিলাম। হুকা হাতে লইয়া সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ গণেশ বাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন এবং জ্যেষ্ঠ সহদরের মত আমার স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন। দেখিলাম ইহাঁরা ঠিক কলিকাতার বন্ধুদের মত নহেন! তাঁহাদের বান্ধবতা মুখের কুশলবার্ত্তাতেই শেষ, এঁরা কিন্তু স্নেহে দান ও প্রতিদান—উভয়ের জন্যই লালায়িত। হরিদাস হালদার মহাশয়ের দ্বারা আমি সেই জমিটা কিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই হরিদাস হালদার এক অদ্ভুত জীব। বয়স আমার সমতুল্যই হইবে। নধরকান্তি,একান্ত নির্ব্বিরোধ—ঝগড়া দেখিলে সে স্থান ত্যাগ করেন; সর্ব্বদা তামাক খান, হুকা হাতে বাজার করেন,হুকা হাতে রাস্তায় বেড়ান; হুকাহাতে দাওয়ায় বসিয়া থাকেন, নারদের সঙ্গে তার বীনার যে সম্বন্ধ, হুকার সঙ্গে ইহাঁর তাহাই, এমন নিষ্কর্ম্মা লোক বিরল,

নিত্য অভাব। একদিন আমি বলিলাম "আপনাদের অনেকগুলি নারকেল গাছ আছে, কতক কতক ফল বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও তো কিছু হয়—কষ্টে থাকেন,এতেও তো কিছু সুবিধা হতে পারে।"খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কথা বলিতে যাইয়া কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল, অনেক কষ্টে মুখ হইতে কথা বহির্গত হইল, তখন খুব বড় দুই জোড়া গোঁপের মধ্য হইতে একটা বড় রকমের হাঁ বাহির করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"আমি কালীহালদারের ছেলে, আমাকে আপনি নারকেল বেচতে বল্‌ছেন! হায় রে হায়!"পরবৎসর সপরিবার কাশী গিয়াছিলাম। হরিদাস হালদার ছিলেন আমার সঙ্গী। একদিন আড়াই সের মাংস বাজার হইতে আনিয়া দেখি, খোকা (কিরণ) আর আড়াই সের আনিয়াছেন, মোটে ৫।৬টি প্রাণী, এত মাংস দিয়া কি হইবে? আমি বলিলাম তিলভাণ্ডেশ্বরের কাছে কায়স্থ বাড়ী আছে, ইহাঁরা আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে চাহেন—এঁদের বাড়ীতে ২॥০ সের মাংস তত্ত্ব করা যাক্। হরিদাস হালদার আড় হইয়া পড়িলেন,—"সে হইতেই পারে না।" আমি বলিলাম "এই আড়াই সের আপনাকে খাইতে হবে।" "সে দেখা যাবে" বলিয়া হরিদাস খুব জোরে হুকা টানিতে লাগিলেন। রান্না হইল, বৈকালের জন্য একটুকরা মাংসও হরিদাস রাখিতে দিলেন না,—পাঁচসের মাংসই রান্না হইল এবং এই দামোদর-কল্প ব্রাহ্মণ ভুঁড়ির উপরকার কাপড়ের বাঁধটা একটু শিথিল করিয়া দিয়া, তাল তাল মাংস খাইয়া, একাই আড়াই সের নিঃশেষ করিয়া বিষম এক উদ্গার উঠাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া—গেলাসটাকে অগ্রাহ্য করিয়া—একটা বড় ঘটির জল নিঃশেষ করিয়া—ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ দিবা-নিদ্রার জন্য হুকার তামাক, টিকার ছাই প্রভৃতির নিকটস্থ একটা তক্তাপোষে হাত পা ছড়াইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং তাড়কাসুরের ন্যায় নাসারন্ধ্র হইতে এক উৎকট

আওয়াজ বাহির করিতে লগিলেন। আমরা ভাবিলাম "আজ অতি সার হইয়াই মরবে, না হয় পেট ফুলে দমবন্ধ হইয়া কাশী প্রাপ্ত হইবে—বরাৎ ভাল, কাশীতে মরিয়া একবারে নির্ব্বাণ মুক্তি পাইবে।" সন্ধ্যার সময় সেই নাসারন্ধ্র সমুত্থিত-বিপুল মেঘগর্জ্জন থামিয়া গেল। বৌমা সবে সন্ধ্যেবাতি জ্বালাইয়া রান্নাবান্নার ব্যবস্থাতে মনোযোগী হইয়াছেন, ইহার মধ্যে হরিদাস হালদার উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মাংসগুলি খাইয়াছিলাম, কিন্তু ভাত ত বেশী খাই নাই—বেশ ক্ষুধা হইয়াছে। রান্নার আয়োজনটা শীঘ্র করিয়া ফেলুন।"

হরিদাস এখন আর তেমন খাইতে পারেন না, ভুঁড়িটাও অনেক সংবরণ করিয়াছেন।

আমি বেহালায় বাড়ী করিয়া পল্লীবাসী হইলাম। গণেশবাবু কত বিষয়ে আমাকে কত রকম সাহায্য করিয়াছেন; দুর্গাপ্রসন্ন বাবু, কৃষ্ণ বাবু এঁদের সঙ্গে একত্র বেশ দিন কাটাইয়াছি;—আমার পুকুরের ধারে চাঁপাগাছে অজস্র চাঁপা ফুটিত, মনে হইত যেন ঝাঁকে ঝাঁকে হলুদ পাখী গাছটির শাখায় শাখায় পাতার আড়ালে আড়ালে বসিয়া আছে,—আম ও গুবাক্ গাছ গুলির ফাঁক দিয়া যখন প্রাতঃ সূর্য্য তাঁর আলোর শর সন্ধান করিতেন, তখন বাগান বাটিকাটি যেন পুলকে কাঁপিয়া উঠিত। শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে 'কোকিল' 'চোখ গেলরে' 'বউকথা কও' এর কলরব শুনিয়া মনে হইত যেন রাজ-রাজেশ্বরের ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য বন্দীরা বন্দনা করিতেছে। আমি বাগানটি খুব পরিস্কার রাখিয়াছিলাম—ছয় বিঘার মধ্যে একটা খড় কুটো পড়িতে দেয় নাই। কলিকাতা হইতে আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রায়ই যাইতেন,—জলধর সেন, অক্ষয় বড়াল, মণিলাল গাঙ্গুলী, প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী, রসময় লাহা, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র সমরেন্দ্র, সুধীন্দ্র, করুণা নিধান, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়,

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত-রঞ্জন, হেমেন্দ্র কুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শিশির কুমার, প্রভৃতি বন্ধুরা দয়া করিয়া পায়ের ধুলা দিতেন, আহারাদি করিতেন, জলধর দা বেহালা গেলেই পুকুরে খুব সাঁতরাইয়া আমোদ করিতেন, গরম গরম পরেটা ফরমাইস দিতেন। বাড়ীটি পরিষ্কার রাখিতে আমাকে অনেক খরচ করিতে হইত। তিনটা বাহিরের লোক বাড়ী ঝাঁটদিত। একদিন বেহালার বড় ঝড় হইয়া গেল। রাস্তা ঘাট সমস্ত ভাঙ্গা ডালেও পাতায় ভর্ত্তি হইয়া বেহালায় তিন ফিট আবর্জ্জনা জমিয়া গেল। আমার বাড়ীতে গাছ বিস্তর; ঝড় একটু কমিয়া গেলে আমি তিনটি ঝি ও তিনটি চাকর, এবং রাঁধুনি ঠাকুর এদের প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া ঝাঁটা দিলাম এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী সাফ করিয়া ফেলিতে বলিয়া দিলাম। তাঁরা মেয়ে পুরুষে একত্র হইয়া খুব ফূর্ত্তির সঙ্গে বাগান সাফ করিয়া ফেলিল। আধ ঘণ্টা পরে আকাশ নির্ম্মল হইল, গাছের ডালে কোকিল ডাকিতে লাগিল. পুকুরের নীল জল আবার স্থির হইয়া গেল, চাঁপা গাছের ডাল হতে দুই একটি করিয়া ফুল পড়িতে লাগিল,—এত ফুল যে ঝড়েও সমস্ত গুলি নিঃশেষ করিতে পারে নাই। ছয় বিঘার বাগানে একটি পাতা রহিল না। বেহালার বন্ধুরা আসিলেন.তাঁরা জিজ্ঞাসা করি-লেন "সে কি ? আপনার এখানে যে একটি ও পাতা পড়ে নাই ?—সমস্ত পল্লীটি যে ডালপাতার নীচে পড়িয়া গেছে !" আমি বলিলাম "কই, দেখ্‌তে পাচ্ছেন, এখানে ত ডালপাতা কিছুই নাই " তখন তাঁহারা অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক জল্পনা আরম্ভ করিতে লাগিলেন। কেউ বলিলেন "পূর্ব্ব দিকে নারকেল গাছগুলির মাথার উপর দিয়া ঝড় চলিয়া গেছে, নীচেকার গাছে, ঝড় পায় নাই।"একজন বলিলেন—"ঝড় বোধ হয় এই বাড়ী পর্য্যন্ত এসে থেমে গেছে, যেমন বৃষ্টি কোন কোন জায়গায় এসে থেমে যায়, তা

তো প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।" আর একজন বলিলেন "তেতালা বাড়ীটা সামনে থাকাতে ঝড় প্রতিহত হইয়া এগুতে পারে নাই"। কেউ বল্লেন "ঝড় পাতাগুলি উড়াইয়া নিয়া রাস্তায় ফেলেছে—বাগানটি তাই পরিষ্কার রয়েছে।" কিন্তু কেউ বল্লেন না "এতগুলি চাকর বাকর রহিয়াছে, ইহারা সাফ করিয়া ফেলিয়াছে।"

বস্তুতঃ মানুষের চেষ্টায় যে জঙ্গল সাফ হইতে পারে, বেহালার লোকের যেন এ ধারণা নাই। ডোবাগুলি অপরিষ্কার, তাহা সাফ করিবার প্রবৃত্তি নাই; বেশ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যদি বলেন তাঁকে "আপনার বাড়ীর কাছে জঙ্গল রেখেছেন কেন?" উত্তরে বলবেন "আরে ম'শয়,ও কি আবার জঙ্গল? যদি দশ বৎসর পূর্ব্বে আস্‌তেন,তবে দেখ্‌তেন দুচারটা বন-বরা ছুটে আসছে।" গ্রামে সাপ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন"সাপ?কই সাপ,আমাদের গ্রামে সাপ টাপ নেই।"তার পর দিন এক দিন এক সাপ দেখাইয়া দেওয়া হ'ল। তখন বল্লেন "ওটা'হেলে' ও আবার সাপ! ওটা কেঁচো,ছেলেরা লেজ ধরে টেনে খেলা করে, ও আবার সাপ!" তার পর একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইলাম—উত্তরে শুনিলাম "কিছু ভয় করবেন না, মহাশয়, ওটা দাঁড়া সাপ, বিষ নাই, দেখতেই ভয়ানক, বড় নিরীহ harmless।" তারপর সত্য সত্যই এক দিন একটা বড় গোখ্‌রার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। গ্রামবাসী এক জনকে বলিলাম—"এটাকে কি বল্‌বেন?" তিনি দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিলেন "মহাশয় এটা বাস্তু, ইহাকে না উস্কালে কোন অনিষ্ট করে না, এঁরা বাড়ীর লক্ষ্মী।" গ্রামে কাহাকেও সাপে কামড়াইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলে দুই হাত নাড়া দিয়া "না,না, সেটি আমাদের গ্রামে এখন ও হয় না"বলিতে থাকেন; কিন্তু একদিন একটি সাপে কাটার খবর পাওয়া গেল, তখন কপালে আঙ্গুল ঠেকাইয়া বলিলেন"ও সব নিয়তি"পাঁচ বছরের ছেলে হইতে আশী বছরের

বুড়, যাহাকে সাপে কাটার কথা বলিবেন, তাহারই একমাত্র অদ্বিতীয় উত্তর "নিয়তি"। বস্তুতঃ "নিয়তি" পল্লীগ্রামের সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। ডোবা জঙ্গল, সাপ, ম্যালেরিয়া সকল সমস্যার এক সমাধান 'নিয়তি' ঐ কথাটি উচ্চারণ করিলেই সমস্ত দায়িত্ব হইতে খালাস। বাড়ীর এত কাছে চৌরঙ্গীর বড় বড় রাস্তা, বড় বড় বাড়ী হইতে পুরুষ-কারের জয়কেতু পৃথিবী-জয়ের দুর্জ্জয় স্পর্দ্ধা ও প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে, আর চার মাইল দূরে বেহালা আপনাকে নিয়তির হাতে নিঃসহায় ভাবে ছাড়িয়া দিয়া বর্শী দিয়া মাছ ধরা, দাবা, তাস ও পাশা খেলা দ্বারা মহামূল্য সময়ের শিরে বজ্রাঘাত করিতেছে। ম্যালেরিয়া বেহালায় থাকে মাত্র তিনটি মাস, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক কিন্তু অপর সময় কলিকাতা হইতে স্বাস্থ্য ভাল; ম্যালেরিয়া কোন বছর হয়, কোন বছর হয় না। সেই ম্যালেরিয়াই বা দোষ কি দিব? আমার প্রতিবেশী ৺ মনোহর পণ্ডিত মহাশয় ৭৫ বছর বয়সে একটা অতি জঘন্য ডোবায় প্রাতঃকালে নামিতেন, ঘন গুল্মের জঞ্জালগুলি সাফ করিতে। ১২টার সময় ডাঙ্গায় উঠিয়া আহারাদি করিয়া আবার সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, রাত্রি ৮ টার সময় উঠিতেন, এই ভাবে দিন রাত্রি সেই অতি বিকট ডোবায় সাত দিন ক্রমাগত পড়িয়া থাকার পর তাঁহার জ্বর হইল। আমি দেখিতে গেলে বলিলেন 'পাজি জায়গা—একটু জল গায়ে পড়েছে, কি জ্বর হয়েছে।" অনেক সময় দেখিয়াছি, সকালে জ্বর হইয়াছে, দুপুরে অল্প অল্প জ্বর আছে,—তাই লইয়া বিনা ছাতায় বকের মত পুকুর পাড়ে বসিয়া কোন ব্রাহ্মণ বর্শী জলে ফেলিয়া ধ্যানী বুদ্ধের মত স্থির হইয়া আছেন, অনাবৃত মাথায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে গ্রাহ্য নাই। সাবধান থাকিলে জ্বর হয় না। আর সকলই ভাল;—মাছ, দুধ, সন্দেশ, ফল সস্তা ও সব সময় পাওয়া যায়। ডাক্তার-

কবিরাজের সংখ্যা ও যথেষ্ট। গ্রাম্য সুখের অবধি নাই। আহার করিতে বসিয়া প্রায়ই দেখিতাম, হরিহরের মাতা, কৃষ্ণদা কিম্বা অপর কোন ব্রহ্মাণ-বাড়ী হইতে ব্যঞ্জনাদি আসিয়াছে। মেয়েরা ঘোমটায় অর্দ্ধেক মুখ ঢাকিয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলিতেন, যে স্নেহ-বান্ধবতা কলিকাতায় শুষ্ক ভদ্রতায় পর্য্যবসিত, সেই স্নেহ-বান্ধবতার পল্লী লক্ষ্মী, মুখে ঢল ঢল। এই গ্রাম্য জীবনের জন্য কলিকাতায় থাকিয়া প্রাণ হাঁপিয়া উঠিত। তার পর রঞ্জন বিলাস বাবু আসিয়া বাড়ী করিলেন, বৃদ্ধ হইলেও স্ফুর্ত্তি কি? ছোট ছোট মেয়েদের খোপা খুলিয়া দেওয়া, তিন বছরের বালিকাকে বিয়ে করিবার ভয় দেখান, এস্রাজ হাতে করিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ঢুকিয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন গান করা, এদিকে আশু বাড়ুয্যের বাড়ীতে পল্লীরাজনীতির কূট বিশ্লেষণ, গণেশবাবু, দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর একনিষ্ঠ সততা ও আন্তরিক সাহায্য,— অক্ষয়বাবুর প্রাণ খোলা হাসি ও কৃষ্ণদার আদর আপ্যায়ন— অপর দিকে কোকিল, 'বউ কথাকও'এর ডাক, ফুল্ল সন্ধ্যা-মালতী, চাঁপা ও গন্ধরাজের সুবাস ও বকুল ও সিউলি গাছ হইতে অপর্য্যাপ্ত পুষ্প-বৃষ্টি, আমার বাড়ীর সেই ঐন্দ্রজালিক শোভামণ্ডিত পুকুর-পাড়টি,—হরিসভার বাৎসরিক উৎসব, মান্নাদিগের রাস ও মেলা, কৈবর্ত্তদের ঘেটুর গান—এই সমস্ত গ্রাম্য আনন্দ আমার চিত্তকে জোর করিয়া দখল করিয়া লইয়াছিল। কলিকাতা হইতে রোজ রাত্রে বেহালার ফিরিবার পথে মাথার উপর নীল পদ্মের মত নীলাকাশ যেন বিকাশিত হইয়া উঠিত, সেই নীলের মধ্যে শ্বেত চন্দনানুরঞ্জনের ন্যায় চন্দ্রলেখা ও নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিত। আমি ট্রামে বসিয়া সেই শোভা দেখিতাম ও "চন্দন চর্চ্চিত নীল-কলেবর পীত-বসন বনমালী" প্রভৃতি জয়দেবী কবিতা আবৃত্তি করিতাম। এই পল্লী সুখানুভবের সময় আমার 'মুক্তাচুরি' 'রাগরঙ্গ' 'রাখালের রাজগী,' 'কানুপরিবাদ'

ও 'শ্যামলী খোঁজা' লেখা হইয়াছিল, 'নীলমানিক' লেখা হইয়াছিল, 'ফোক লিটারেচার' বই তৈরী হইয়াছিল, এগুলির সমস্তই পল্লীপ্রসঙ্গ লইয়া।

আমাদের পাড়ায় একটা জিনিষের সঙ্গে আমার কিছুতেই ঐক্য হইত না! সেটা অনারেবল সুরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে বিরোধ। ইনি সাউথ সুবারবণ মিউনিসিপালিটির সভাপতি এবং কাউন্সেলের ডিপুটি চেয়ারম্যান। মূর্ত্তিটি সুন্দর। অর্দ্ধপক্ক দাড়ি আবক্ষ-লম্বিত, ঋষির মত কতকটা যেন গাম্ভীর্য্যের আভাস দিতেছে। গৌর বর্ণ, ক্ষীণ, দেহ, মাঝে মাঝে বাতরোগে কষ্ট পান, কর্ম্মঠতার বিরাম নাই। বেঙ্গল লেজিস্লেটীভ কাউন্সিলে ইনি চুপ করিয়া থাকেন নাই, দেশের অনেক কাজ করিয়াছেন, ইংরেজীতে বড় বড় বই লিখিয়াছেন ঐশ্বর্য্যের তুঙ্গ শৃঙ্গ বসিয়া আছেন, কিন্তু বেহালায় পল্লীলক্ষ্মী যখন নিকটবর্ত্তী মহানগরীতে পদাঙ্ক স্থাপন করিতে যাইয়া একপা মাত্র বাড়াইয়াছেন, তখন ইনি যেন 'তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহাকে স্বীয় গ্রামে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সুরেন্দ্র-বাবুর প্রসাদে বেহালায় ট্রাম হইয়াছে, জলের কল হইয়াছে; বোধ হয় শীঘ্রই বৈদ্যুতিক আলো হইবে। তাঁহার চেষ্টায় বাজার ও হাই স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি। ইনি শত্রুর সহিত শত্রুতা করেন না, অন্যায়কারীকে জব্দ করিবার চেষ্টা নাই, তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ক্ষমা। কিন্তু একটু নিরীহ স্বভাবের সুবিধা পাইয়া বেহালার এক দল লোক ইহাঁর বিরোধী, নানারূপে ইহাকে আক্রমণ করিতেছেন। এই গ্রাম্য দলাদলি হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়াছি। কাহার পিতামহ কুটীরে বাস করিতেন, সুতরাং পৌত্র অনাদিকাল হইতে বড় মানুষ নহেন; কাহার পুত্রের বিবাহে কে নিজে না আসিয়া কবে তাঁহার আত্মীয় স্বজন পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করতঃ কাহাকে অভূতপূর্ব্ব অপমান করিয়াছেন; কাহার বাড়ীতে কে না যাইয়া তাঁহার অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন; কোন দিন কে পক্ষপাত

করিয়া কাহার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, পল্লী-রেজিষ্টারী খুঁজিয়া এই সকল দেখার আমার কোন দরকারই নাই। আমি ক্রমাগত সাত পুরুষ এক গ্রামে থাকিয়া পল্লী-বিরোধ উত্তরাধিকার-সূত্রে পাই নাই, সুতরাং সে সকল বুক ঠোকাঠুকি ও আস্ফালনের মধ্যে আমি ছিলাম না। কিন্তু সুরেন-বাবু ও তাঁহার ভ্রাতাদের সুন্দর সৌম্য স্নিগ্ধ মুর্ত্তি দেখিয়া প্রীত হইয়াছি, তাঁহাদের অজস্র স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহারা যে গ্রামের সকলের অপেক্ষা বড়, তাহা বুঝিয়াছি, শুধু ধনে মানে শিক্ষা দীক্ষায় নহে—সত্যবাদিতায়, ক্ষমায়, নৈতিকচরিত্রে ও তাঁহার বড়। ঐশ্বর্য্যবান হইয়াও তিনি বেহালা ছাড়িয়া কলিকাতায় প্রলুব্ধ হন নাই—তিনি দেশ-ভক্ত, ইহা বুঝাইতে দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

বেহালা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া আমার তৃতীয় পুত্র বিনয় বি এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে এবং বেহালার স্কুল হইতে আমার চতুর্থ পুত্র বিনোদ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছে। বেহালা হইতে আমার জামাতা তমোনাশ দাস বাঙ্গলা ও ইতিহাসে এই দুই পরীক্ষায় এম, এ, পাশ করিয়াছেন, সুতরাং বেহালার স্মৃতি আমার নিকট প্রীতিকর। দুই বৎসর হইল আমার মধ্যমা কন্যা ফুলবালা দেবী ৬ টি অপগণ্ড শিশু রাখিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় ইন্‌ফ্লুজা হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, সেই ঘোর অশুভ বার্ত্তা যে দিন বেহালার শুনিয়াছিলাম, সেদিন বেহালার প্রতিবেশী রমণীরা আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন। সে শুধু মৌখিক ভদ্রতা নহে, কলিকাতায় বন্ধুত্ব ঘোষণা হইতে তাহার কত তফাৎ!

———

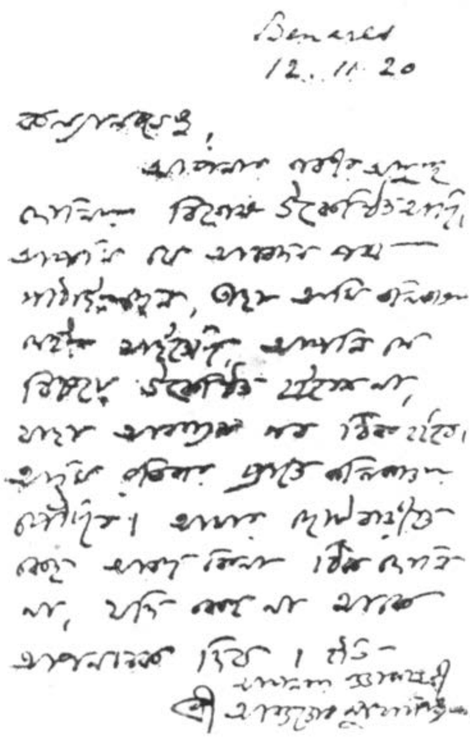
বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক

১৮০৫ অব্দে আমি বি এ পরীক্ষায় বাঙ্গলা পরীক্ষক হইবার জন্য আরজী করিয়ছিলাম। তখন পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পরে পূর্ব্ববঙ্গের লেখকগণের মধ্যে তিনিই অগ্রনী ছিলেন। গৌরবর্ণ দীর্ঘ কান্তি, মুখখানি গোল ছন্দ, কপালের উর্দ্ধে ছোট একটী আঁচিল,তাহা মুখখানির লাবণ্য যেন বাড়াইয়া দিয়াছিল, দাগটি দেখিয়া আমরা হাফেজের "আগর আঁ তুরক সিরাজি"আওড়াইয়া তাঁহাকে প্রথম দিন অভিনন্দন করিয়াছিলাম, আমি রাজা বাগানের বাড়ীতে থাকিতে তিনি কয়েকবার আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের জলধর, দীনেশবন্ধু ও পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত তিনটি লেখকই কানে একটু খাটো ছিলেন, ইহাঁদের মধ্যে গুপ্ত মহাশয়ের শ্রবন শক্তিটা একটু বেশী দুর্ব্বল ছিল, কিন্তু ঠিক কানের গোড়ায় ঢাক পিটাইতে হইত না। হৃদয়টি ছিল তাঁর সরলতার খনি এবং হাতের অক্ষর ছিল চোখ ভুলানো। রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর (ত্রিপুরার রাজমন্ত্রি) ছিলেন রজনী বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু রজনী বাবু কখনই নিজের নামের পশ্চাতে তাঁহাদের কৌলিক 'দাস' উপাধি ব্যবহার করিতেন না,শুধু 'গুপ্ত'

লিখিতেন। এইস্থানে জলধর বাবুর সম্বন্ধে একটি কথা লিখিব, ইনি হিমালয়ে গোপ-বধূর ভাণ্ডের দুগ্ধ পানের চিত্র দিয়া আমাদিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন, এখন উপন্যাসগুলি দিয়া আমাদিগকে কাঁদাইয়া ছাড়িতেছেন।

৮ রজনী পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষকের পদ প্রার্থী হই। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস চেন্সালার, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইনের খসড়া তখনও প্রস্তুত হয় নাই, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা তখনও ম্যাট্রিকুলেসনে পরিণত হয় নাই। ভাবিলাম একবার ভাইস চ্যান্সলারের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি, তখন আমি ১৭ নং শ্যাম-পুকুর লেনে থাকি। শনিবার দিন, বেলা ৮ টার সময় ভবানীপুরে উপস্থিত হইয়া একখানি কার্ড পাঠাইলাম। এখন ইনি দোতলার যে ঘরটায় লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন, তখন সে ঘরে বসিতেন না,সেই ঘরের সংলগ্ন উপরের লম্বা ঘরটায় বসিতেন। আমি তাঁহার নিকট দাঁড়াইবা মাত্র তিনি বলিলেন "আপনি তো ১৭ নং শ্যামপুকুর লেনে থাকেন ?" আমি "বলিলাম কি করিয়া জানেন ?"—"কেন ? আপনি যে আরজী করেছেন, তার নীচে তো ঠিকানা আছে।" আমি বলিলাম "সে আরজি তো আফিসে আছে।"—তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরজীতে যা লেখা আছে,তা বুঝি আর কারু মনে থাকতে পারে না ?" আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম,কত লোক তো কত আবেদন করিয়া থাকে, কিন্তু একজন আবেদন-কারীর বাড়ীর নম্বর শুদ্ধ ঠিকানাটি মনে করিয়া রাখা সহজ নয়। ইহার পরে তিনি বলিলেন,"আমার কাছে এসে খুব ভাল করেছেন।"না হইলে পরীক্ষকের পদটি পেতেন না !"আমি বলিলাম'আমার আসা না আসায় দাবীর তারতম্য কি করে হয়েছে ?"তিনি আবার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "কি করে হয়েছে ? তবে শুনুন, আপনার বন্ধু বান্ধবেরা

ও সিণ্ডিকেটের গণ্য মান্য সদস্য গণের কেউ কউ আপনার কাজ না হওয়ার জন্য বেশ একটি ফন্দী এঁটেছিলেন; তা ভ্যাস্ত হয়ে গেল। আপনার দাবী যে সবকার চাইতে ভাল, এটা তো আর কেউ প্রতিবাদ করতে পারেননিকো, আপনি গ্রাজুয়েট, বাঙ্গলার এত বড় খানি বই লিখে প্রাণপাত করেছেন,—গভর্ণমেণ্ট আপনাকে বিশেষ বৃত্তি দিয়েছেন, সে বিষয়ে তো আর কথাটি চলে না। কিন্তু তাঁরা আপনার কথা তুলতে বলে উঠলেন, আপনার মাথা একবারে খারাপ হয়ে গেছে, এমন কি আপনি লোক চিনতে পারেন না—লেখা পড়ার শক্তি একবারে হারিয়েছেন ও বিছানায় থেকে উঠতে পারেন না। যা হউক এখন আপনাকেত নিজের চোখে দেখলুম, এবার জবাব দিতে পারব। তাই বলছিলুম, আপনি না এলে আপনাকে কাজ দেওয়ার পক্ষে মুস্কিল হত, এবার অপনার কোন ভয় নাই।" আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে প্রণাম করিয়া, চলিয়া আসিলাম। তার পর পরীক্ষক হইয়া কাজ করিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে খুব কমই গিয়াছি। বিজয়া-দশমীর দিন ভবানীপুরে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছি। ইহার পর একদিন শুনিলাম, বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাকে"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য রিডার নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। এই সম্মান বড় কম নহে, কারণ ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালী এ পদ পান নাই। পৃথিবীর জোড়া যাঁহাদের নাম, এমন সকল বড় বড় সাহেব রিডার হইয়াছিলেন। শুনিলাম,সিণ্ডিকেটে একটা আপত্তির তুফান উঠিয়াছিল। কেউ বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা ভাষায় গৌরব এত বড় নহে যে তজ্জন্য একটা রিডারের সৃষ্টি হইতে পারে। কেউ বলিয়াছিলেন, দীনেশবাবু অপরাপর রিডারের তুলনায় নগন্য ব্যক্তি। কিন্তু ভাইসচেন্সালর নিজে যেটি বুঝেন তা বুঝাইয়া দেওয়ার তার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—তিনি নাকি শেয়ে



Benares
12. 11. 20

কল্যাণবরেষু,

[illegible]

ইতি –
শুভানুধ্যায়ী
শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
বাঙ্গলা চিঠি।

বলিয়াছিলেন, "I know my man" "যিনি যে কাজের যোগ্য আমি তাঁকে সেই কাজ দিই।"

তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলাম, 'ইংরেজী অনেক দিন লিখি নাই, লিখ্‌তে পারবে তো?' তিনি বলিলেন 'ঠিক পারবেন!'

এই একটা কথায় যেন আমার মধ্যে তড়িৎ শক্তি সঞ্চারিত হইল। আমি ভাবিলাম, অপর সকলে ত এভাবে কাজ করেন না, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি এ কাজ পারবে কি?' কিন্তু আমার একটি ছত্র ইংরেজী লেখা না দেখে তিনি বিশ্বাস করিলেন 'আমি পারব' প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিয়া দিলেন এবং আমাকে স্বীয় শক্তিতে সন্দিহান দেখিয়া অভয় দিয়া বলিলেন 'ঠিক পারবেন।'

আমি আমার দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলাম 'হে ঠাকুর, আমি যেন ইহাঁর কথার গৌরব রাখিতে পারি, ইনি পরম বিশ্বাসে প্রতিকূল ব্যক্তিদিগকে নিরস্ত করিয়া এ কাজের ভার আমাকে দিয়েছেন, ইহাঁকে যেন আমার জন্য বিদ্রূপ না শুনিতে হয়!'

আমি এক সময়ে ক্লাসে ইংরেজী ভাল লিখিতে পারিতাম বলিয়া খ্যাতি ছিল, কিন্তু বহু বৎসর ত শুধু বাঙ্গলাই লিখিয়া আসিয়াছি; এখন যে এত গুলি ইংরেজী বই লিখিয়াছি—তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। ইহাঁরাই উৎসাহ আমার লেখনীকে শক্তি দান করিয়াছে, আমার বই যখন বিলাতে আদৃত হইল, বড় বড় য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রশংসা লাভ করিল, তখন আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম, "হে ঈশ্বর, আমার নিয়োগ-কর্ত্তার মান রাখিয়াছ, আমি কাজে বিফল হইলে যে শ্লেষ ও টীট্‌-কারী পড়িত, তাহাতে আমি অপদস্ত হইতাম না— কিন্তু ইনি একটু অপ্রস্তুত হইতেন।" তারপর একদিন রোগের শয্যায় পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ একদা প্রাতে ধর্ম্মপদের অনুবাদক চারু বাবু

আমায় বলিয়া গেলেন, আমি ইউনিভার্সিটির 'ফেলো' হইয়াছি। অযাচিত ভাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই সম্মান প্রদান করিয়াছেন। যতই তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার সুবিধা হইল, ততই ইহার 'মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম' প্রতিভা আমার চক্ষে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল। সিনেটে বহুসংখ্যক উচ্চ পদস্থ মনস্বী সাহেব ও বাঙ্গালী সদস্য একত্র হইয়া ইহাঁর প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন, কেহ কেহ এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে এমনই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন,যে মনে হইত, সেই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে আর কি কথা থাকিতে পারে? হয়ত ইংরেজ-বাঙ্গালী একত্র হইয়া তিন চারি ঘণ্টা কাল সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে একবারে লৌহস্তম্ভের মত দৃঢ় করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু শেষে যখন আশুতোষ উঠিলেন, ১৫ মিনিট কাল তাঁর গভীর কণ্ঠের উচ্চারিত শব্দের গোলাগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ব্ব-পক্ষকে ধূম্রাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, এবং শেষে উপসংহারে ইহাঁর সিদ্ধান্ত বিদ্যুতের মত এমনই স্পষ্ট,এমনই আশ্চর্য্যরূপ উদ্দীপনার ভাষায় প্রকাশিত হইল, যে ৬০।৭০ জন সদস্য সম্বলিত সভা একবারে স্তব্ধ হইয়া দেখিলেন, যে প্রতিপক্ষের যুক্তি-হর্ম্ম্য-শিরে একবারে বজ্রপাত হইয়া তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। এম, এ পরীক্ষার অধ্যাপনার ভার বড় বড় কলেজ হইতে তুলিয়া নিয়া যে দিন বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, সে দিন কি ভীষণ প্রতিবাদের ঝটিকাই না উত্থিত হইয়াছিল! ৩৫টী ধারা লইয়া কয়েক মাস ব্যাপিয়া সিনেট সভায় বাদানুবাদ হইয়াছিল—রেগুলেশন পরিবর্ত্তনের কত প্রস্তাব কতবার হইয়াছে—এই বিরাট দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত তর্কবিতর্কে ভগবৎ দত্ত ক্ষমতার বলে অদ্বিতীয় সারথী বিশ্ববিদ্যালয়ের রথ চালাইয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা বুদ্ধির প্রখরতায় অন্যত্র দিগ্বিজয়ী, তাঁহারা ইহাঁর প্রতিভালোকের কাছে

দিবা-প্রদীপবৎ হইয়া গিয়াছেন ; কোন সাহেব বা কোন বাঙ্গালী ইহাঁর নিকট উচু মাথায় দাঁড়াইতে পারেন নাই।

ইনি স্বদেশী ভাবের উপর শিক্ষার ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছেন—সিনেট-সিণ্ডিকেট এখন বাঙ্গালীর আয়ত্ত। ইনি দেশীয় পরিচ্ছদকে সম্মানিত করিয়াছেন, বড় বড় সাহেবের পার্শ্বে বাঙ্গালী সদস্যেরা ধুতি চাদর পরিয়া সিনেট সভা অলঙ্কৃত করেন। অধ্যাপকগণ বিদেশী সাজ সজ্জা একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সমস্ত ভারতের পণ্ডিত মণ্ডলীকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আহ্বান করিয়া আমাদের বিদ্যাগারকে এক মহা জাতীয়-কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছেন। বৌদ্ধ স্তূপাকৃতি টুপি পরা তির্ব্বতীয় লামা, বিচিত্র বর্ণে অনু-রঞ্জিত পাগড়ী পরিহিত মারহাটা, স্ফীতোজ্জ্বল গণ্ড তীব্র চক্ষু জাপানি ও চিনেসাহেব, গৈরিক রঞ্জিত আলখাল্লা পরিহিত সিংহলী ভিক্ষু, নেকটাই ও হ্যাটধারী ইউরোপীয় পণ্ডিত,—স্বর্ণপা'ড় দীপ্ত উত্তরীয় গায়ে মাদ্রাজী, কত ভিন্ন বর্ণ, কত ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিত আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভূষিত করিতেছেন—পঞ্চতল সৌধ আকাশভেদী জয় পতাকা তুলিয়া এই বিভিন্নদেশী অধ্যাপক মণ্ডলী অলঙ্কৃত হইয়া আজ বাঙ্গালী প্রতিভাকে ভারতবর্ষে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার 'আজীবক শ্রেনী' সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "বঙ্গভাষার ইতিহাস" ডাঃ ইয়ামোকামার বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং অপরাপর অধ্যাপককের মৌলিক গবেষণা—প্রাচ্য প্রত্নতাত্বিক রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছে,—পোষ্ট গ্রাজুয়েটের কাজ অব্যাহত ভাবে চলিলে অচিরে প্রাচ্য জ্ঞানের যে দীপ এই গোলদীঘির বিদ্যামন্দিরের চূড়ায় জ্বলিবে, তাহা সমস্ত জগতের দিগ্‌দর্শনী হইবে। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সম্প্রতি যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, এবং স্যারজর্জ্জ গ্রিয়ারসন, জুলে ব্লক, প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী

এই বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি করিয়া যে সকল চিঠিপত্র লিখিতেছেন, তাহাতে আমাদের বিদ্যাশালার নবজাগরণে প্রাচ্য বিদ্যার আলো-কেন্দ্র যে প্রতীচ্য হইতে পুনরায় প্রাচ্যে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই গৌরব সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছেন। স্যার আশুতোষের গ্রাজুয়েটের দল অক্ষৌহিণীর সেনার ন্যায় বঙ্গদেশের হাট মাঠ বাট ছাইয়া ফেলিতেছেন। গ্রাজুয়েটের সংখ্যা বাঙ্গালাদেশে বাড়িয়া গিয়াছে—ইহাই কাহারও কাহারও আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নূতন রেগুলেসনের ফলে পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই রেগুলেসনের বলেই স্যার আশুতোষ এদেশের পক্ষে অন্যরূপ বিধান করিতে পারিয়াছেন। দেশের শিক্ষাশক্তি এ দেশে কল্যাণকারী হইয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছে। বজ্র ধ্বংসের জন্য আরোপিত হইতে পারে, কিন্তু সেই বজ্র ব্যবহারের গুণে আবার রক্ষার উপাদানও হইয়া থাকে। আজ উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা দেশের দেশের প্রতি পল্লীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে এই যে উচ্চ-শিক্ষার স্রোত অবাধভাবে বহিয়া গিয়া এ দেশের সভ্যতাকে শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন করিতেছে—এই মহাদান আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। প্রাইমারী শিক্ষার বিস্তৃতি অপেক্ষাও এই উচ্চ শিক্ষার বিস্তৃতিতে এ দেশ লাভবান হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের দারিদ্র্য ঘুচাইবার স্থান সরস্বতীর মন্দির নহে, আমগাছের নীচে যাইয়া বেল ফল প্রত্যাশা করা বৃথা। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষাও উচ্চ শিক্ষার অন্তর্গত করা যায়; অর্থাভাব না হইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সকল দরজা খুলিয়া রাখার ব্যবস্থা অনায়াসে হইতে পারে। ভবিষ্যতে যদি ভারতের নেতৃত্ব করিবার লোকের দরকার হয়, তাহা হইলে এই উচ্চ শিক্ষার গুণেই বঙ্গদেশ হইতে যত লোক আমরা সরবরাহ করিতে পারিব, অন্য কোন প্রদেশই

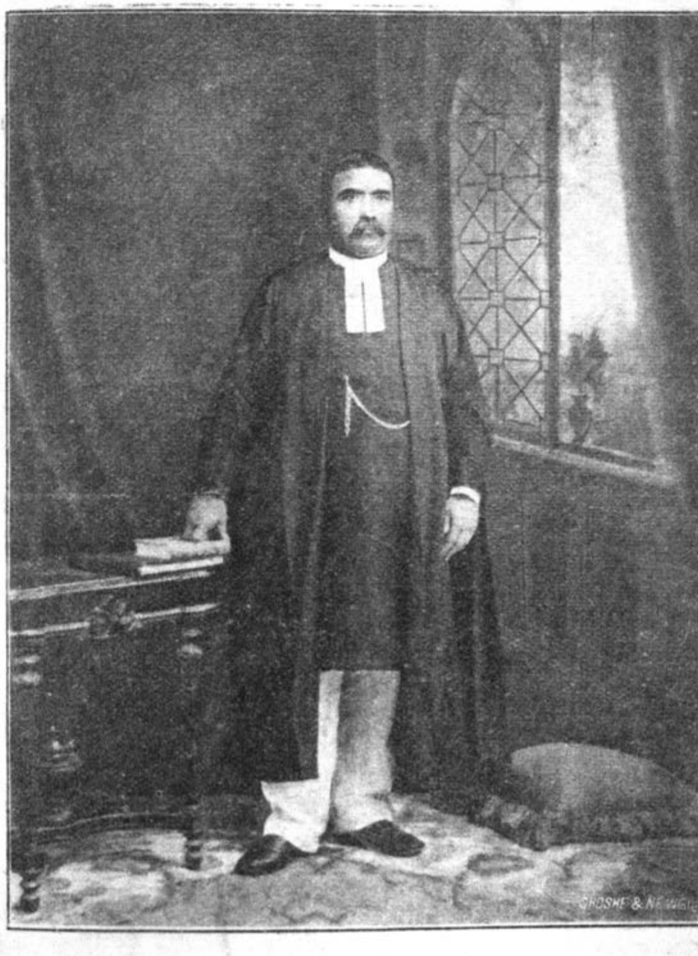
তাহা পারিবে না.। মাড়োয়ারীর ধন দৌলত ও ব্যবসায়ের বুদ্ধি তাহাকে নেতৃত্ব পদ দেবে না.—ভারতীয় উন্নতির পথে বাঙ্গালীই বড় থাকিবে। আমাদের অর্থের অভিমান নাই, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি ও শিক্ষার অভিমান আছে। বাঙ্গালী যে জন্য শ্রেষ্ঠ, সেই একমাত্র পথরোধ করিলে বাঙ্গালার গৌরবকে কণ্ঠ চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইবে। এই একটি পথ তৈরী হইয়াছে, বাঙ্গালীর আর কোন পথ নাই, অপরাপর পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা আমরা অবশ্য করিব, কিন্তু তাই বলিয়া যে একটি বৃহৎ পথ খোলা আছে, যাহা এখনও যশ মান ও ক্ষমতার দিকে বাঙ্গালীর পক্ষে রাজপথ হইয়া আছে – সেটিকে প্রতিরোধ করা কি আত্মহত্যা হইবে না? সেই পথে লইয়া যাইবার পক্ষে স্যার আশুতোষ ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তিনি মানুষ, সুতরাং তাঁহার কোন দোষ নাই, একথা বলা যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি মহাসমুদ্রের পাড়ে আসিয়া শুধু জলের লবনত্ব খুঁজিয়া নাসিকা কুঞ্চন করে,—হিমাদ্রি দেখিতে আসিয়া তাহার পাদমুলের কাঁকরের নিন্দা করিয়াই চলিয়া যায়, তাহার গুণগ্রাহিতার প্রশংসা আমরা করিতে পারিব না। যিনি বিষয়-নিস্পৃহ যোগীর ন্যায় অসামান্য ত্যাগের দ্বারা—স্বীয় অতুল্য মহাশক্তির প্রয়োগে—আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জগতের চক্ষে সমুজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়া যাঁহারা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অভিমানের প্রবৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহারা মিত্র বলিয়া পরিচয় দিলেও আমরা তাঁহাদিগকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বিশ্বাসের জায়গায় আমাদের অবিশ্বাস আসিয়াছে।

এই সুবিস্তৃত শিক্ষার ভিত্তিতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, ভারতবর্ষের অন্যত্র তাহার আশা করা অসম্ভব।

যে অক্লান্ত কর্ম্মী মহাজন বিনিদ্র চক্ষে, অশ্রান্ত হস্তে, অকুণ্ঠিতচিত্তে—জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে উর্ব্বর করিবার জন্য হলচলনা করিতেছেন,

তাঁহার চর্ম্ম মশকদংশনে ব্যথা অনুভব করে না, তাঁহার চিত্ত প্রতিকূলতায় অধিকতর দৃঢ় সংকল্পারূঢ় হয়, বিরুদ্ধ অবস্থায় আরো যুযুৎসু হইয়া উঠে। এই মানুষটিকে আমি যেরূপ দেখিলাম, এরূপ আর একটি দেখি নাই, ইহা অত্যুক্তি নহে।

মুখুজ্জ্যা মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ইহাঁর প্রবল বক্তিত্বের দরুণ দয়া-গুণটি কতকটা আড়াল পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পর্ব্বতরাজের আঁড়ালে সুরধুনী খেলা করিতেছেন, এবিষয়ে যেমন সন্দেহ নাই—দৃঢ় পুরুষোচিত মহিমামণ্ডিত আশু-চরিত্রের নিগূঢ় স্থানে যে দ্রবময়ী গঙ্গার ধারার ন্যায় দয়ার স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে—যাঁহারা তাহাকে জানেন—তাঁহারা সেটি শতবার লক্ষ্য করিয়াছেন। একদা একটি ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতেছিল, বাঙ্গালা পরীক্ষার দিন জর হওয়াতে পরীক্ষা দিতে পারিল না। সে নিতান্ত গরীব, আশুবাবুর নিকট যাইয়া কাঁদিয়াই আকুল, তাহার এক নিরুপায়া বিধবা মাতাকে জমিদার আশা দিয়াছেন, ম্যাটিকুলেসন পাশ হইলে ছেলেটিকে একটা চাকুরী দেবেন। সে পরীক্ষায় ফেল হইলে মাতা-পুত্র উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। এ অবস্থায় আশুবাবু কি করিতে পারেন? যে পরীক্ষা দেয় নাই, তাকে কি করিয়া পাশ করানো যায়? ছেলেটি সম্ভব অসম্ভব অবস্থার সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না, সে যুক্তি তর্ক মানিল না, কাঁদিয়াই আকুল—সে কান্না নিরাশ্রয়ের কান্না, শোকার্ত্তের কান্না, তাহা আশুবাবুর প্রাণ ছুঁইল, অমনই উপায় হইল। তিনি বলিলেন "বস্, ভাব্‌তে হবে না, তুমি আই, এ পরীক্ষার বাঙ্গালা পেপার যেদিন হবে, সেদিন পরীক্ষা দিতে ব'সে যেও।" ম্যাট্রিক এবং 'আই' এর, বাঙ্গালা প্রশ্ন অনেকটা একরূপ, শেষোক্ত পরীক্ষা একটু শক্ত, এই মাত্র প্রভেদ, কিন্তু উভয় পরীক্ষায়ই কোন পুস্তক হইতে প্রশ্ন হয় না, শুধু রচনার কৃতিত্ব দেখাইতে



স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

হয়। ইহার বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইলেন না, যে হেতু জ্বরের জন্য ছেলেটি পরীক্ষা দিতে পারে নাই এবং সেই ত্রুটি সংশোধন জন্য সে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। এই যে উপায়টি আশুবাবুর মাথায় এসেছিল –তাহা তাহার গভীর দয়ার দ্বারা প্রবর্ত্তিত। তিনি "আহা" "উহু" প্রভৃতি সহৃদয়তা ব্যঞ্জক কথা বলিয়া আর্ত্তকে সান্ত্বনা করেন না, তাঁহার দয়াবৃত্তি কার্য্যকরী, সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি বিপন্নকে উদ্ধার করেন। আমি নিজে জীবনে তাহা বহু বার অনুভব করিয়াছি। আমার এক পদস্থ বন্ধু একবার বিপদে পড়িয়া আশুবাবুর চেষ্টায় অব্যাহতি পান। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—"ইনি যে ভাবে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, যে নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন; আমার পিতা তাহার অপেক্ষা বেশী করিতে পারিতেন না।" অথচ সেই ব্যক্তির সঙ্গে আশুবাবুর কোনই সম্বন্ধ ছিল না। লোকের কষ্টের কথা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, এবং যদি কোন অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তির উপকার করিতে না পারেন, তবে লজ্জিত হন;যেন বঙ্গদেশের যাবতীয় দুঃখীর দুঃখ নিবারণের দায় তাঁহারই। আমাদের দেশের ভদ্র-পরিবারদের দুঃখের সম দুঃখী ব্যক্তি ইহাঁর মত এদেশে আর কেহ নাই। কত শত লোককে তিনি যে কতভাবে উপকার করিয়াছেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার "ফি" বাড়াইবার কথা লইয়া তাঁহার শত্রুর দল তাঁহাকে নানারূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রদের প্রকৃত হিতৈষী ও ব্যথিত তাঁহার মত তাঁহাদের কেহই নহেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, একটি ছাত্র আজ কালকার দিনে ৩০০৲ শত টাকার নীচে বাৎসরিক খরচ নির্ব্বাহ করিতে পারে না, সেই জায়গায় মাত্র ৫৲ টাকা বাড়াইলে ৩০৫৲ টাকা হয়। ডাক্তারেরা 'ফি' বাড়াইয়াছেন, কলেজে স্কুলে মাসে মাসে ছাত্রগণ বেশী

'ফি' দিতেছে, সমস্ত জিনিষ পত্র বেশী দামে কেনা হইতেছে, এই সময়ে বৎসরে একবার মাত্র ৫৲ টাকা দিলে আমাদের বিশ্ববিত্যালয় টিকিতে পারে, এই ৫৲ টাকা প্রতি ছাত্র দিলে আমাদের ১½ লক্ষ টাকা আয় বাড়িয়া যায়, নতুবা বিশ্ববিত্যালয় চলিবে না। তিনি শুধু এই প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, চাঁদা তুলিয়া একটা ফণ্ড সৃষ্টি করিবার উদ্যোগে ছিলেন, যাহাতে নিতান্ত অসমর্থ ছাত্রকে সাহায্য করা যাইতে পারিত। এই প্রস্তাবটি বাতিল করার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয় আজ টলমল। ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি নহে, বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের মুখে দেওয়ার জন্ত কেহ কেহ কোমড় কাছিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা-সংকোচ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা সিংহকে মূষিক হইয়া বাঁচিয়া থাকার উপদেশ দিতেছেন। আমার বিবেচনায় ঐরূপ জীবন না থাকাই ভাল।

হিব্রু, গ্রীক, কেমিষ্ট্রী-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব বিভাগের উন্নতির জন্য স্যার আশুতোষের যে ভবিষ্যদৃষ্টি আছে, সেই সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণেরও তাহা নাই। জাতি গঠন করিবার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডার চালাইতেছেন। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যরূপ মহারথের নগণ্য চক্র মাত্র। তের চৌদ্দ বৎসর যাবৎ আমি ইহাঁকে বাঙ্গালায় এম এ.পরীক্ষার সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিয়া আসিতে-ছিলাম, প্রতি বারই ইনি উপেক্ষার ভাবে আমার অনুরোধ এড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিন বৎসর হইল তিনি নিজে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "এইবার বাঙ্গালায় এম এ, পরীক্ষার ব্যবস্থা করিব,আসুন,নিয়ম-গুলির খসড়া তৈরী করি।" তখন একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি তো বাঙ্গালায় এম, এ পরীক্ষার জন্য আমায় বহুদিন ধোরে ক্রমাগত অনুরোধ করেছেন, আপনি ভেবেছিলেন, আমি একবারে উদাসীন।

তা নয়, দীনেশবাবু, তোড়জোর নেই, কি নিয়ে কাজ করব, শেষে একটা কাণ্ড ক'রে ব'সে ব্যাকুব বন্‌ব? এই কয় বৎসর ধ'রে আমি আপনাকে দিয়া "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" সঙ্কলন করাইয়াছি, ইংরেজীতে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস লিখাইয়াছি, বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রাম্য কথা-সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি কত বই লিখাইয়াছি, রামতনু লাহিড়ী রিচার্চ্চ ফেলো-সিপের সৃষ্টি করিয়াছি, দাসগুপ্ত, বিজয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকগণের দ্বারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বই তৈরী করাইয়াছি—কোন একটা উদ্দেশ্য ছাড়া এই সকল করিয়াছি কি? এম, এ পরীক্ষা হইবে, কি পড়াব? তার তো একটা ব্যবস্থা আগে ক'রে ফেলে তবে তো কাজে হাত দেব! আপনারা চেঁচামিচি করেছেন, ততক্ষণ আমি জমি তৈরী করে নিয়েছি।" তখন বুঝিলাম আমরা জগন্নাথের রথের চাকা,—শুধু ঘুরে গিয়েছি মাত্র, যাঁহার মতলবে ঘুরেছি, তা নিজেরাই জান্‌তে পারি নাই। এই জন্যই বঙ্গেশ্বর কারমাইকেল সাহেব সত্যই বলিয়াছিলেন "কোন এক বিরাট বিষয় কল্পনা করিবার শক্তি যেরূপ স্যার আশুতোষের আছে, তেমনই সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার যোগ্য কর্ম্ম-শক্তিও ইহাঁর আছে।" এই দুই গুণের সমন্বয় সংসারে বড় দুর্ল্লভ।

সমুদ্রের মত প্রকাণ্ড আশ্রয় পাইলে যেরূপ যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী তাহার দিকে আপনা আপনি ছুটিয়া আসে, ধূর্জ্জটী তাঁর জটা খুলিয়া গঙ্গাধারাকে ও ছাড়িয়া দেন—সেই আশ্রয়ের ভরসায়;—সেইরূপ পালিত, ঘোষ ও খয়রা প্রভৃতি নানাদিক্ হইতে—এই কর্ম্মবীরের আশ্রয়ে মুক্ত-স্রোতে অজস্র দান আসিয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাহা ছুটিয়া আসে নাই, তাহাদের লক্ষ্য আশুতোষ। এমন কি, ইহাঁরই দরুণ শিবজটা হইতেও কুটিল মিণ্টো প্রভৃতি লাটের কোষাগার হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া কয়েকটি ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া পৌছিয়াছে।

আশুবাবুর একাধিপত্যে কেহ কেহ বিরক্ত, এই একাধিপত্য জাতীয় গৌরব-ব্যঞ্জক। ব্যক্তিগত ভাবে আশুবাবুর একটি ভিন্ন ভোট নেই, এই আধিপত্য গায়ের জোরের নহে, "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"—বিষ্ণু শর্ম্মার সময় কিম্বা তাঁহারও পূর্ব্ব হইতে অনাদিকাল হইতে এই বল স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, ইহা পশুরাজের আধিপত্য নহে, ইহা নররাজের আধিপত্য, ইহা পৈত্রিক দাবী কিম্বা তোপ-কামাণের দ্বারা সমর্থিত বাহুবল নহে—ইহা ভগবৎ দত্ত ত্রিলক-লিপির জোরে দাঁড়ায়। ক্রমোয়েল, নেপোলিয়ান, গ্লাডষ্টোন, লয়েডজর্জ্জ ইহাঁরা সাম্যবাদীদের মধ্যে সিংহাসন পাইয়াছেন—আশুবাবুর সেই সিংহাসন। ইহাঁর মত কর্ম্মবীর আমি দেখি নাই। সাম্যতন্ত্রবাদীদের ইহাতে আপশোষের কোন কারণ নাই। স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রান্ত বিষয়-গুলি এত জানেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ, তিনি এরূপ সর্ব্বতো-ভাবে উচ্চ শিক্ষার হিতকামী, এরূপ ত্যাগপরায়ণ ও নিঃস্বার্থ, যে অপর কোন বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি ইহার সমকক্ষ নহে। ইহাঁকে বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির নায়কত্ব কি আমাদের কল্যাণকর হইবে? শুনিলাম হাইকোর্টে আশুবাবু আর দুই জন সহকারী জজ লইয়া একবার এজলাসে বসিয়াছিলেন। তিন জনে ৮০৩ খানি রায় একবৎসরে লিখিয়াছিলেন, তার মধ্যে ৮০০ খানি লিখিয়াছিলেন আশুবাবু, আর দুই জনে লিখিয়াছিলেন তিন খানি। অবশ্য অনেকেই জানেন যে আশুবাবুর রায় গুলি প্রায়ই খুব পাণ্ডিত্য পূর্ণ এবং সুদীর্ঘ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এরূপ কেন হইল?" তাঁহার এক বন্ধু উত্তরে বলিলেন 'সেরূপ পৃথিবীতে সর্ব্বদা হয়ে থাকে, কেউ সংসারে সর্ব্বদা শ্রম করে, কেউ বিশ্রাম করে ;" হাইকোর্টে আশুবাবু কর্ম্মঠতা অপরিসীম, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেরূপ কাজ করেন তাহা ৩।৪ জন সাহেব একত্র

হইয়া পারিবেন কি না সন্দেহ। প্রতি মাসে বহুসংখ্যক সভা—সিনেট, সিণ্ডিকেট, ফ্যাকালটি, বোর্ড, পোষ্ট গ্রাজুয়েট সমিতি ত আছেই তা ছাড়া প্রশ্ন করা পরীক্ষা করা, প্রভৃতি শত শত কাজ। প্রত্যেক সভার তিনি কাণ্ডারী, সর্ব্বে সর্ব্বা, অপরেরা চাল-চিত্র,—কবি কেন লঙ্কাধিপের যে দশমুখ কুড়ি হস্ত কল্পনা করিয়াছিলেন—ইহার বিরাট কার্য্যশীলতা দেখিলে কতকটা অনুমান করা যায়। এই জন্য বলিয়াছি এরূপ কর্ম্মবীর আমি দেখি নাই। তিনি বেঞ্চ হইতে বারে নামিলে মাসে ৫০,০০০, টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তিনি তাঁহার এই বহুমূল্য শ্রম বিশ্ববিদ্যালয়কে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিতেছেন, এরূপ ত্যাগীই বা কে? যখন এত করিয়াও কেবল প্রতিকূলতা, বিদ্রোহ, আক্রমণ ও মিথ্যা অভিযোগ সহিতে হইয়াছে, শাসনের তুঙ্গ শৃঙ্গ সিমলা শৈল হইতে যখন এত করিয়া ও নির্য্যাতন চোখ-রাঙ্গানী সহ্য করিয়াছেন, অন্য হইলে ত তখন ধিক্কার দিয়া কাজ কর্ম্ম গুটাইয়া ফেলিত, এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ব্যাপার হইতে ঘৃণায় সরিয়া বসিত। কিন্তু আশু সে শর্ম্মাই নহেন। এমতাবস্থায়ও তাঁহার নিকট যাইয়া শুনিয়াছি "কোন ভয় নাই, আমরা তো খাটিব এই সর্ত্তে এসেছি, ফল যা হবে, হোক না, দমবার কারণ নেই, শেষ পর্য্যন্ত খেটে মরব।" তখন মনে হয়েছে গীতার "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ন ফলেষু কদাচন" শ্লোকটি বিরাট গুম্ফ ও তেজো দৃপ্ত বপু লইয়া যেন আমার চক্ষের সাম্‌নে মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কয়েক মাস হইল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় লালগোলার রাজার নিমন্ত্রণে তথাকার স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, সেখানে যাইয়া রাজা যোগীন্দ্র নারায়ণের যে সাত্ত্বিক মহিমা-মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাতে প্রাচীন হিন্দুরাজার আদর্শটি চক্ষে পড়িল। লালগোলা ষ্টেশনে ভোর পাঁচটায় পৌছিয়া দেখি, গেরুয়া রঙ্গের একটি

সামান্য রকমের বৈরাগীর আলখাল্লা পরিয়া নগ্নপদে রাজাবাহাদুর আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তখন তিনি চাতুর্ম্মাস্য করিতেছিলেন, অর্থাৎ সন্ধ্যায় একবার সামান্য আহার করিতেন, সারাদিন কিছু খাইতেন না ; নিরামিষ খাওয়া, কিন্তু তাহার মধ্যে আম, কমলানেবু প্রভৃতি সমস্ত সুখাদ্য ফল ভগবানকে বহুবৎসর ধরিয়া নিবেদন করিয়া বসিয়া আছেন, সুতরাং অতি কঠোর জীবনই যাপন করেন,—"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে" মহাপ্রভুর এই উপদেশ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে দেখা দিল। কিন্তু নিজের প্রতি যিনি এইরূপ কঠোর বিধান করিয়াছেন, অপর সম্বন্ধে তাঁহার মুক্তহস্তে ভোজনের ব্যবস্থা। তথাকার দরিদ্র ও অতিথি মাত্রই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। লালগোলাধিপের মুক্ত-হস্ত দানের কথা বাঙ্গলাদেশে সকলেই জানেন। সাহিত্য পরিষদে বোধ হয় ইনি ৫০,০০০, টাকা দিয়াছেন। সেদিন বহরমপুর হাঁসপাতালের জন্য লক্ষ টাকা দিয়াছেন। শত শত গ্রন্থকারকে ইনি আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহার এই অজস্র দান হইতে বর্ত্তমান লেখকও বঞ্চিত হন নাই। আমার 'বেহুলা' 'গৃহশ্রী' ও 'ওপারের আলো' এই তিন খানি বহীর প্রথম সংস্করণের ছাপার সমস্ত খরচ ইনি বহন করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাঁহার টাকা থাকে, তিনিই দান করিতে পারেন, অনেক সময় তাহা প্রতিষ্ঠালাভের উপায় হয়। কিন্তু রাজাবাহাদুরকে তথায় যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না। তিনি শতাধিক কুড়ানো ছেলেকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বামুন হইতে সুরু করিয়া মুসলমান ও মুচি প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর অনাথবালক আছে। ইহাদিগকে তিনি ভাল ধুতি শাড়ী. নানারূপ ছিটের কাপড়, সতরঞ্চী, সুজনী, কারপেট প্রভৃতি বুনাইতে শিখাইয়াছেন, ইহাঁরা হাতীর দাঁতের উপর কাজ করিতে শিখিতেছে। এই উদ্দেশ্যে মৃজাপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি

কারিগর আনাইয়া ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের একটি প্রেশ আছে, এই সকল অনাথ বালকই তথায় কম্পো- জিটারের কাজ শিখিতেছে, তাঁহার হাই-স্কুলে ইহাঁরা পড়িতে পায়। সুতরাং প্রতিটি ছেলের যথেষ্ট গুণপনা আছে। এই কুড়ানো ছেলেদেরে তিনি এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, যে কলিকাতা সহরে আসিলে ইহাদিগের জীবিকা অর্জ্জনের বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু রাজা বাহাদুর ইহাদিগকে সমস্ত কাজ শিখাইয়াও অভিমানী হইতে দেন নাই। কোন ব্যক্তি লালগোলা হইতে অন্যত্র গেলে এই সকল ছেলেরা মোট বহিয়া ষ্টেসনে লইয়া যায়। সন্ধ্যাকালে দেখিলাম রাজা বহাদুর এই ছেলে- গুলি লইয়া মজলিস বসাইয়া দিলেন। তিনি ইহাদের অনেককে উৎকৃষ্ট রূপ গান বাজনা শিখাইয়াছেন, ইহাঁদের কেহ কেহ নর্ত্তকী সাজিয়া সুন্দররূপ নাচিতে ও গাইতে লাগিল। রাজাবাহাদুর নিজের অবজ্ঞাত অনাথ প্রজাদের লইয়া এই ভাবে একদিকে কর্ম্মক্ষেত্র, অপর দিকে উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যদিও নিজে সংযমী ও কঠোররূপে ব্রাহ্মণ্য ব্রত পালন করেন, তথাপি তিনি নিম্নতম শ্রেনীর হিন্দু কি মুসলমান প্রভৃতি জাতিকে আদৌ ঘৃণা করেন না, এই উপবাসশীল ব্রত নিরত ব্রাহ্মণকে আমি মুচি ও মুসলমান ছেলেদিগের গায় হাতদিয়া আদর করিতে দেখিলাম। ছোটখাট শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে তিনি এই কুড়ানো ছেলেদের মধ্য হইতে বাছিয়া ব্রাহ্মণ বালক দিগকে খাওয়াইয়া পদ্ধতিটি রক্ষা করেন। ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আমরা ছিলাম, এই সময়টা রাজা বাহাদুর উপবাসী ছিলেন, বয়স ৭২, আনন্দময়, একবারও বসিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা। তাঁহার শিল্প-বিদ্যালয় শ্রীরামপুর বিদ্যালয় হইতে নানা গুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহার ঘোষণা নাই; ইনি একান্ত আড়ম্বরহীন ও

সর্ব্বদা দেশের কল্যাণ লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার হাই স্কুলের বোর্ডিংএ ছাত্রদের মাত্র ৫৲ টাকা দিতে হয়, প্রতিটি ছাত্রের পাছে, আর ও ঢের লাগে—তাহা রাজ-সংসার হইতে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ লালগোলায় 'রাজা' দেখিলাম না,—রাজর্ষি দেখিয়া চোখ ভুলিয়া গেল।

পুস্তক বড় হইয়া গেল, আমার শত শত বন্ধুবান্ধবের অনেকের কথাই লিখিতে পারিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুবন্ধু,—কাহাকে ছাড়িয়া কাহার কথা লিখিব। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক বসন্ত রঞ্জনের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে আসে, তাঁহার শুভ্র দাড়ীর চুলগুলি যেরূপ কুটিল, মনটি তদনুপাতে সরল; যদি ও প্রাচীন পুঁথির চর্চ্চা করেন, নবীন জগতের সঙ্গেও বিলক্ষণ যোগ রাখিয়াছেন। বহুবৎসর হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু এখন ও সেই শোকে রাত্রে ঘুম হয় না,—স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলিলেই চক্ষের কোণে অশ্রু দেখা দেয়। বসন্ত বাবুর মত অমায়িক বন্ধু বিরল, দরকার হইলে বন্ধুর উপকারার্থ শারীরিক ও মানসিক নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে ইনি প্রস্তুত; নিরামিষ ভোজী কিন্তু মাছের ভাল ব্যান্নুন হইলে সেইদিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়াছি। স্ত্রীর শোকেই নিরামিষ খান, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় তাঁহার চুড়ির নিক্কন সংযোগে মৎস্যের রান্না ইনি অবহেলা করিতে পারিতেন না, হস্তের সেই মধুর শব্দ সহকারে পরিবেশন হইলে এখনও খাইয়া তৃপ্ত হইতেন। পুরুষ হইয়া ও তাঁহার এই বৈধব্যযোগ ললাট লিপি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে হারাইয়া প্রকৃতই দুঃখিত হইয়াছি, এরূপ সরল, উদার, মধুর প্রকৃতি, পণ্ডিত-শিরোমণি দুর্ল্লভ। ডাক্তার ভাণ্ডারকার তাঁহার সুরঞ্জিত পাগড়ি লইয়া মধুর হাস্যে ও নানারূপ শ্লেষোক্তির আপ্যায়ন দ্বারা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জায়গাটা দখল করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তুলনা নাই,

ইনি পণ্ডিতোচিত সাজসজ্জার খড় কুটোর মধ্যে জলন্ত অগ্নি; বামুন-পণ্ডিত বলিয়া ইহাঁকে উপেক্ষা করা চলে না। ইহাঁকে রাগাইলে ইহাঁর পণ্ডিতী মুক্ত কচ্ছ মল্লবেশে পরিনত হয়, এবং রাগের কলম শাণিত তরবারীর আকার ধারণ করে, এত বড় জেদী লোক বিলাত ফের্ত্তাদের মধ্যে ও দুর্ল্লভ, কিন্তু যাঁহারা ইহাঁর বন্ধুত্বের অভিমানী তাঁহারা জানেন,—ইহার প্রাণটি ভীমনাগের সন্দেশের মত মিষ্ট। আমাদের প্রিয় শ্যামা প্রসাদের বুকটা যেমন চওড়া, প্রাণটাও তেমনি গড়ের মাঠের মত খোলা। এখন যাহারা সিণ্ডিকেট ও সিনেটের তরুণ সদস্য তাঁহাদের মধ্যে মন্মথরায় ও প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুদ্বয় নানাগুণে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন, প্রথমটি তাঁহার সদাশয়তায় ও দ্বিতীয়টি তাঁহার জলন্ত প্রতিভায়। আর একজনের নাম স্বতঃই এই সঙ্গে মনে হয়, কিন্তু শুনিলাম সিঁড়ি হইতে পা পিছলিয়া পড়িয়া তাঁহার মাথায় আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহার স্মৃতি-ভ্রংশ হইয়াছে। রেজিষ্ট্রার মিঃ জ্ঞানঘোষ এবং কণ্ট্রোলার রায় বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র—কে বেশী ভালমানুষ, আড়াআড়ি করিয়া তাঁহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কাহার সৌজন্য বেশী তাহা এখন ও সুধীমণ্ডলী মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অতি নম্র, বিনয়ী, ও সাধু চরিত্রের লোক, কিন্তু ইহার ভিতরে যে অনন্য সাধারণ কঠোরতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে, তাহা "বঙ্গবাণী" পত্রিকার প্রকাশের চেষ্টায় বুঝিয়াছি। ইনি যে বিষয়ে হাত দিবেন, তাহা গড়িয়া তুলিবেন—এটি আমি ভবিষ্যৎবাণী করিতেছি—সঙ্কল্পের পেছনে পেছনে ইহার অনাড়ম্বর অথচ অক্লান্ত অধ্যবসায় আছে, অল্পভাষী—কিন্তু যেটুকু বলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হইতে বিরাট প্রযত্ন। মৎস্য ধরিবার চেষ্টায় নিরত, বড় বাজারের দোকান-দর্শী, অঙ্কশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত শীর্ণকায়, মহা-

চতুর, মহাপ্রাজ্ঞ সতীশ বাবু মহাশয়কে নমস্কার জানাইতেছি। যাঁহারা বাঙ্গলায় এম,এ পাশ করিয়াছেন,তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বপতি চৌধুরী সাহিত্য-জগতের উদীয়মান প্রতিভা। গানে, চিত্রাঙ্কনে, সমালোচনায়, কবিতা-রচনায় ও গল্পলেখায় ইহার যে শক্তির পরিচয় পাইতেছি, তাহা হরিদ্বারের গঙ্গার ন্যায় সূক্ষ্মস্রোতা হইলে শুভযোগ সমন্বয়ে কালে কল্লোলিনী স্রোত-স্বতীতে পরিণত হইতে পারে, আশা করি আমার এই ভবিষদ্বাণী সফল হইবে।

আর জায়গায় কুলাইল না, তথাপি নবীন বয়সে প্রবীণ বুদ্ধি সম্পন্ন,—গম্ভীর প্রকৃতি, অনড় কর্ম্মব্রতী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মুক্তহস্ত বদান্যবর দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, স্নিগ্ধ অমায়িক ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, এবং প্রাতঃ সেফালিকাশায়ী শিশির-কণার মত নম্রতা ও সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি শিশির কুমার মিত্র—বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকাশকগণে উদ্দেশ্যে প্রীতি নমস্কার জানাইয়া, পুস্তকখানি সাঙ্গ করিতেছি। আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে, মুখের কথায় তুবড়ীর আগুন, লেখনীর সম্পদে অসামান্য, বাগ্দেবীর প্রসাদে কল্পতরু সম; রহস্যের তিক্ত-মধুর আমলকী, গুণগ্রাহিতার নেংড়া আম,—সামাজিক তত্ত্ব বিদ্রূপের কণ্টকাবৃত বেল,—কোন ফল তোমার কাছে না পাওয়া যায়? প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতির তুমি ঘুন, কিন্তু হইলে কি হইবে? কি অভাবে, পাঁচকড়ি, তোমার ক্ষুরধার প্রতিভা ভোতা হইয়া গেল? আমাদের উক্তিতে যদি রাগ কর—তবে বুঝিব তুমি আর শোধরাইবে না—একবারে hopeless. তোমার প্রতিভা-সুন্দরীকে নানা সাজে সাজাইয়া ভগবান কেন সেই সুন্দরীর কপাল হইতে সিন্দুরের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা জানি না, সে সৌন্দর্য্য দেখিলে ভয় হয়। কিন্তু আলাপে—গল্পে—আপ্যায়নে—স্নিগ্ধ ব্যবহারে তোমার ব্যভিচারী প্রতিভাকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না।

সাহিত্য-জগতের এক কোণে মধুর বিনয়ে নিজেকে আবৃত করিয়া যতীন্দ্রনাথ পাল উপন্যাস লিখিয়া যাইতেছেন। তাঁহার লেখনীই বেশী ক্ষিপ্র কি মুদ্রাযন্ত্রই বেশী ক্ষিপ্র—তাহা জানি না। এত লিখিলে যাহা হয়, তাহাই হইতেছে—"এক পাড়া কুঁড়ুলী" ছাড়া আর কোন একখানি পুস্তক তেমন উৎরাইল না। আরও কত বন্ধু রহিয়া গেলেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান লেখক তাঁহাদের গুণের আদরে ও বন্ধুত্বের অভিমানে কাহার ও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে। বন্ধুবর ঐতিহাসিক নিখিলনাথ, যাঁহার চোখ দুটি দেখিলে মনে পড়ে "একি হরি একি দেখি। ঘুমে ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।" তিনি তাঁহার রচিত অধিকাংশ পুস্তক পুলিস কমিসনার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়াতে পক্ষচ্ছিন্ন জাটায়ুবৎ হইয়া আছেন।

নবদ্বীপের বিদগ্ধ জননী সভার মহামহোপাধ্যায়গণ আমাকে 'কবি-শেখর' এবং ভারতীয় ধর্ম্ম মহামণ্ডল আমাকে 'প্রত্নতত্ত্বভূষণ' উপাধি দিয়াছিলেন। এ বৎসর বিশ্ব বিদ্যালয় আমাকে "ডি, লিট" এবং গভর্ণমেণ্ট "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন, কিন্তু এবৎসরের ভগবৎদত্ত সমস্ত সুখ বিষ মিশ্রিত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। নানা রূপ পারিবারিক বিপদে আমি ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিতেছি। এই সকল বিপদ দিয়া ভগবান এই দুর্ব্বলের বল পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি বল না দিলে আমি কিরূপে নিজেকে রক্ষা করিব ?

সম্পূর্ণ